ইউনিট-২

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ

অধিবেশন-১: বৃদ্ধির ধরন ও দৈহিক পরিণমন

অধিবেশন-২: আবেগ ও উদ্বিগ্নতা

অধিবেশন-৩: আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আবেগ

অধিবেশন-৪: স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ও বয়ঃসন্ধিকাল

অধিবেশন-৫: এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের ৮ স্তর

অধিবেশন-৬ : বুদ্ধি ও গার্ডনারের বহু উপাদান বুদ্ধি তত্ত্ব

অধিবেশন-৭ : জেন্ডার ও জেন্ডারের ভূমিকা

অধিবেশন-৮ : এরিকসনের জীবন বিকাশ ও গার্ডনারের বুদ্ধি তত্ত্বের সমালোচনা

ইউনিট-২ অধিবেশন-১

বৃদ্ধির ধরন ও দৈহিক পরিণমন

ভূমিকা

শিশু জন্ম গ্রহণ করে, আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এই বড় হওয়ার ক্ষেত্রে তার অনেক রকম পরিবর্তন হতে থাকে। যেমন : তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে, ওজন বাড়তে থাকে, হাত পা বড় হতে থাকে, হাত দিয়ে সে কিছুই ধরতে পারত না আস্তে আস্তে কিছু ধরা - পরে নিজ ইচ্ছামত সঞ্চালন করতে পারা, হাঁটতে- দৌড়াতে ও খেলা করতে পারা, ৬/৭ বছর বয়সে দাঁত পড়ে নতুন দাঁত ওঠা, কথা বলতে পারা ইত্যাদি। এ সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় কতগুলো পরিবর্তন পরিমাণগত আর কতগুলো পরিবর্তন গুণগত। পরিমাণগত (Quantitative) পরিবর্তন হচ্ছে শিশুর আকৃতিগত পরিবর্তন। যেমন: উচ্চতা বা ওজন বৃদ্ধিকে 'বর্ধন' (Growth) এবং গুণগত (Qualitative) পরিবর্তন হচ্ছে শিশুর কোন কিছু করার যোগ্যতার পরিবর্তন। যেমন- হাটতে পারা বা কথা বলতে পারা ইত্যাদি। এভাবেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের Maturity (পরিণমন) ও Experience (অভিজ্ঞতা) বাড়তে থাকে এবং শিশুর বিকাশ সাধিত হতে থাকে।

D‡Ïk¨

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বর্ধন ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- "পরিণমন" ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা ও পরিণমনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- শৈশব থেকে বাল্য ও কৈশোর কালের শরীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৃদ্ধি ও হারের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারাবুদ্ধির কার্যকরী সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমন

জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার শারীরিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তেমনি তার মানসিক পরিবর্তন ও হতে থাকে। জন্ম গ্রহণের পর নবজাতক শিশুর ওজন

৫-৮ পাউন্ড এবং দের্ঘ্য ১৭-২০ ইঞ্চি হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে ওজন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। এটা একটি পরিবর্তন। এ ধরনের পরিমাণগত পরিবর্তনকে বর্ধন বলা হয়। জন্মের পর নবজাতকের হাতটি মুষ্টি বদ্ধ থাকে - সে কিছু ধরতে পারে না। ৬ মাস বয়স হলে শিশুটি হাত দ্বারা কোন কিছু ধরতে পারে- এটাও একটি পরিবর্তন। তার হাতের এই কর্ম ক্ষমতার পরিবর্তন বা বৃদ্ধি তার হাতের গুনগত পরিবর্তন, একে বলা হয় বিকাশ।

পরিণমন বা পরিপক্কতা হচ্ছে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন (Maturation is the unfolding of the characteristics present in the person) জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশকে পরিণমন বলা যেতে পারে। শিক্ষা ব্যতিরেকে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশই হচ্ছে পরিণমন। যেমন: বসতে শেখা, দাঁড়াতে শেখা ইত্যাদি। এজন্য কোন শিখন বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন নিচের ছকে বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমনের কিছু উদাহরণ লিপিবদ্ধ করি।

বর্ধন	বিকাশ	পরিণমন
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.

পর্ব-খ: শারীরিক বিকাশ ও পরিণমন

জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শারীরিক বৃদ্ধিতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। ছোট্ট শিশুটি হাটি হাটি পা পা করে একদিন সে শৈশবে উপনীত হয়। তারপর শৈশব থকে বাল্য ও পরবর্তীতে কৈশোরে পৌঁছায় এবং একজন পূর্ণাঙ্গ নারী ও পুরুষে পরিণত হয়। এই যে পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা সকলে দেখছি এবং উপলব্ধি করছি।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটু চিন্তা করুন এবং শৈশবকাল থেকে বাল্য ও কৈশোর কালে কী কী শারীরিক পরিবর্তন এবং পরিণমন ঘটে তা নিচে লিপিবদ্ধ করুন।

-
-
-
-
-

পর্ব-গঃ শিখন ও পরিণমনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দৈহিক পরিণমন

পরিণমন এক প্রকার অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি যার উপর শিখন নির্ভরশীল। যেমন- ৬ মাস বয়সের শিশু হাঁটতে পারে না বা কথা বলতে শিখে না। এগুলো শেখার জন্য শিশুর যে শারীরিক বৃদ্ধি দরকার তা ৬ মাস বয়সের শিশুর হয় না কিন্তু সাধারণত ১ বৎসর বয়সে শিশুর এ যোগ্যতা অর্জিত হয়। পরিণমন নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তি বিশেষ কতটুকু শিখন গ্রহণ করতে পারবে। আমরা যদি ৬ মাস বয়সের শিশুকে দিয়ে লিখাতে চাই তবে তা সম্ভব হবে না। কারণ এ বয়সে তার সে পরিণমন হয়নি। আবার ৫ বৎসর বয়সে লেখা শেখানো অসম্ভব হবে না। কারণ ঐ বয়সে তার ঐ কাজের পরিণমন হয়েছে। দৈহিক ও মানসিক ভাবে পরিপক্কতা লাভ না করা পর্যন্ত ঐ স্তরের কোন শিখন কার্যকরী হবে না।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-১**

মূল শিখনীয় বিষয়

বৃদ্ধির ধরন ও দৈহিক পরিণমন

শিশু জন্মগ্রহণ করে, আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এই বড় হওয়ার ক্ষেত্রে তার অনেক রকম পরিবর্তন হতে থাকে। যেমন : তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে, ওজন বাড়তে থাকে, হাত পা বড় হতে থাকে, হাত দিয়ে সে কিছুই ধরতে পারত না আস্তে আস্তে কিছু ধরা - পরে নিজ ইচ্ছা মত সঞ্চালন করতে পারা, হাঁটতে-দৌড়াতে ও খেলা করতে পারা, ৬/৭ বছর বয়সে দাঁত পড়ে নতুন দাঁত ওঠা, কথা বলতে পারা ইত্যাদি। অসংখ্য এ পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় কতক পরিবর্তন পরিমাণগত আর কতক পরিবর্তন গুণগত। পরিমাণগত (Quantitative) পরিবর্তন যেমন: দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিকে 'বর্ধন' (Growth) এবং গুণগত (Qualitative) পরিবর্তন যেমন: নিজে ফিডার ধরে খেতে পারাকে 'বিকাশ' (Development) বলে আখ্যায়িত করতে পারি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের Maturity (পরিণমন) ও Experience (অভিজ্ঞতা) বাড়তে থাকে - এভাবেই শিশুর বিকাশ সাধিত হতে থাকে।

- **বর্ধন(growth):** বর্ধন হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন (**Quantitative change**)। জন্মের পর শিশুর পা-টি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। সে লম্বা হচ্ছে, ওজন বাড়ছে, হাতটি মোটা হচ্ছে ইত্যাদি। জন্মের সময় শিশুর উচ্চতা ও ওজন যা থাকে বড় হওয়ার সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পায়। জীবনের প্রথম দু'বছর উচ্চতা বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত থাকে। তারপর থেকে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলে।

  জন্মের সময় শিশুর ওজন সড়ে পাঁচ পাউন্ড থেকে নয় পাউন্ডের মধ্যে থাকে। এটাই সাধারণ ওজন। এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। সঠিক গড় ওজন বলা মুশকিল। তবে সাধারণ ভাবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে হালকা হয়। জন্মের পর প্রথম পর্যায়ে ওজন কমতে থাকে। এক সপ্তাহের মাথায় শিশু আবার তার জন্মের সময়কার ওজন লাভ করে। চার মাস বয়সের মধ্যে শিশুর ওজন তার জন্মের ওজনের দ্বিগুণ হয়। এক বছর বয়সে তা তিন গুন হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিন বছর বয়স পর্যন্ত বছরে

গড়ে ৫ পাউন্ড করে ওজন বাড়ে। প্রথম বছর উচ্চতার তুলনায় ওজন বেশি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বছর ওজনের তুলনায় উচ্চতা বাড়ে। দু'বছর পর্যন্ত দৈহিক দিক দিয়ে শিশু দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে।

সারণী: -২.১:

শৈশবের উচ্চতা বৃদ্ধি	
বয়স	*উচ্চতা (ইঞ্চি)*
জন্ম সময়ে	১৯-২০
৪ মাস	২৩-২৪
৮ মাস	২৬-২৮
১ বৎসর	২৮-৩০
২ বৎসর	৩২-৩৪
৫বৎসর	৩৮-৪০

সারণী: -২.২:

শৈশবের ওজন বৃদ্ধি	
বয়স	*ওজন (পাউন্ড)*
জন্ম সময়ে	৫.৫-৯
৪ মাস	১২-১৬
১ বৎসর	১৮-২৪
২ বৎসর	২১-২৭
৩বৎসর	২৫-৩১
৫বৎসর	৩০-৪০

উৎস: (Child Development, Fourth Edition, Elizabeth Hurlock International Student Edition)

ছয় বছরে শিশুদের ওজন জন্মের সময়ের ওজনের প্রায় ৭ গুন বেশি হয়ে থাকে। মেয়েদের গড় ওজন ৪৫.৫ পাউন্ড ও ছেলেদের গড় ওজন ৪৯ পাউন্ড হয়। ৩ বছর বয়স থেকে ১১/১২ বছর বয়স অর্থাৎ বয়:সন্ধিক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত ওজন বৃদ্ধির হার অনেক কমে যায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ওজন ও উচ্চতার এই হিসাব পাশ্চাত্য শিশুদের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী। আমাদের দেশের শিশুদের ওজন ও উচ্চতা এই হিসাব থেকে কিছুটা কম হয়ে থাকে।

- **বিকাশ (Development) :** শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি দিকের পরিবর্তন ঘটে যেটা হচ্ছে গুণগত পরিবর্তন (Qualitative change)। এটাকেই বিকাশ বলা হয়। যেমন- সে পূর্বে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু ধরতে পারত না, ১ বৎসর বয়সে সে ইচ্ছামত থাবা দিয়ে ধরতে পারে। ২ বৎসর বয়সে শিশু নিজ অঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে বলে সাইকেল চালাতে পারে - ইত্যাদি হচ্ছে শারীরিক বিকাশ। বিকাশ বলতে শুধুমাত্র উচ্চতার বৃদ্ধি বা দক্ষতার উন্নতি বোঝায় না - কথা বলতে শেখা, শালীনতা বজায় রাখা, বাল্য বয়সে সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারা, বিবেক- নীতির শাসন মানা, কৈশোর কালে সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দৈহিক পরিবর্তন মেনে

নিয়ে লিঙ্গভেদে ভূমিকা পালন, সচেতন মুল্যবোধ গড়ে তোলা ইত্যাদিও বিকাশ। বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে বর্ধন ও ক্ষয় দুটোই ক্রিয়াশীল। জীবনের প্রথম দিকে ক্ষয়ের চেয়ে বর্ধন এবং জীবনের শেষের দিকে বর্ধনের চেয়ে ক্ষয় প্রাধান্য পায়।

পরিণমন ও অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ধারাকে বিকাশ বলে। Development means a progresive series of changes that occurs as a result of maturation & experience.

● পরিবর্তনের (বর্ধন ও বিকাশের) প্রকারভেদ

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু ব্যক্তির বর্ধন ও বিকাশগত পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তন ৪ (চার) ধরনের :

ক) আকারগত পরিবর্তন (Change in size) ঃ শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উচ্চতা, ওজন ও দেহের আয়তন বাড়ে – যেমন দৈর্ঘ্য ২০″ থেকে ৬০″ তে হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিন্ড, ফুসফুস ইত্যাদিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া।

এ ছাড়া স্মৃতিশক্তি, যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা, প্রত্যক্ষণ এবং সৃজনশীল কল্পনা শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে। যে ছোট শিশুটি সংখ্যার ধারণা সহজে বুঝতে পারতো না সেই বড় হয়ে বিরাট বিরাট অঙ্ক কষতে সমর্থ হয়। এটা তার মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তনের উদাহরণ।

খ) আনুপাতিক পরিবর্তন(Change in proportion) ঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, জন্মের সময় শিশুর মাথা ও দেহের আকারগত অনুপাত থাকে ১ ঃ ৪। প্রাপ্ত বয়সে তা হয়ে দাঁড়ায় ১ ঃ ১২। শিশুর হাত পা ও দেহ যে অনুপাতে বাড়ে চোখ কিংবা মাথা সে অনুপাতে বাড়ে না। জন্ম থেকে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এরূপ আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটে।

গ) পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি(Disappearance of old Features) ঃ যেমন- দুধের দাঁত পড়ে যাওয়া। প্রথম যৌনাবস্থার পর থাইমাস গ্রন্থি বিলুপ্ত হওয়া। শিশুসুলভ কমনীয়তা হারিয়ে যাওয়া, শিশুসুলভ চলাফেরার পরিবর্তন, শিশুসুলভ কণ্ঠ ও

কথাবার্ত পরিবর্তিত হওয়া। রূপকথার কল্পকাহিনীগুলো একসময় তার মনোযোগ কেড়ে নিত, বড় হওয়ার পর তা আর তার মন কেড়ে নেয় না ইত্যাদি। মোট কথা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক তথা আচরণগত অনেক বৈশিষ্ট্য বড় হওয়ার সাথে সাথে হারিয়ে যায়।

ঘ) নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন (Acquisition of New Features) ঃ ক্রমান্বয়ে শিশু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যেমন- দুধের দাঁতের বদলে নতুন দাঁত, গলার স্বর পরিবর্তন, যৌন বৈশিষ্ট্য, নতুন ধরনের আগ্রহ, উদ্বেগ, বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি। অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফলে কথা বলার কৌশল, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনমূলক নৈপুন্য, বিভিন্নপ্রকার খেলার দক্ষতা, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতির কুশলতা সে অর্জন করে।

● বর্ধন ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও নীতি ঃ

মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এই বাড়নকে আমরা 'বর্ধন' ও 'বিকাশ' দুভাগে বিভক্ত করে দেখালেও তা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্য। বর্ধন ও বিকাশের রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিময় ধারা। রয়েছে কিছু বৈশিষ্ট্য ও নীতি। যেমন ঃ

১। বিকাশ সুনির্দিষ্ট ও পূর্বোক্তিযোগ্য ধারা মেনে চলে ঃ

এ ধারা জন্ম পূর্ব এবং জন্ম পরবর্তী উভয় সময়েই ঘটে থাকে। যেমন জন্ম পূর্ব পরিবেশে প্রথম সৃষ্টি হবে 'জাইগট' তারপর কোষ বিভাজন তারপর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন। ঠিক তেমনই জন্ম পরবর্তী সময়ে কথা বলার ব্যাপারে প্রথমে কুজন তারপর অস্পষ্ট উচ্চারণ, আধো আধো বোল, একটি শব্দে পরে সংখ্যা বেড়ে মনের ভাব প্রকাশ। সংক্ষেপে বলা যায় আগের কাজটি আগে পরের কাজটি পরে। কখনও পরের কাজটি আগে হবে না।

২। বিকাশ অগ্রসর হয় কতগুলো ধাপের মাধ্যমে ঃ

মাতৃগর্ভে জাইগট গঠনের পর হতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা য়ায়। প্রত্যেকটি ধাপ বা ভাগের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি ধাপের রয়েছে আবার ক্রমবিকাশমূলক কাজ। বিশেষ ধাপের কাজগুলি যদি কেউ সম্পন্ন করতে না পারে তবে তাকে অস্বাভাবিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের জীবন চক্রকে ভ্রূণ, নবজাতক, শৈশব, বাল্য, ... বৃদ্ধকাল এভাবে মনোবিজ্ঞানীগন বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি পর্যায়ের রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। সে সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বিশেষ পরবর্তী পর্যায়ে যাবার য্যোগ্যতা অর্জন করে।

৩। বিকাশের বিভিন্ন দিকের (Aspect) রয়েছে বিভিন্ন গতি বা হার ঃ

জন্মের পর শিশুর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই হারে বাড়ে না। নবজাতকের মাথাটি দেহের তুলনায় অনেক বড় থাকে কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। জন্মের পর প্রথম ২ বৎসর শিশুর দৈহিক বিকাশ দ্রুত হয় পরে গতি মন্থর হয়ে পড়ে। বয়ঃসন্ধিকালে আবার এ গতি বৃদ্ধি পায়।

৪। বিকাশের গতি সমগ্র থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয় ঃ

প্রথমে শিশুর আচরণের প্রকাশ থাকে সামগ্রিক। যেমন, শিশু যখন কাঁদে তখন তার সারা শরীরই তার সঙ্গে যুক্ত হয়; পরবর্তীকালে বড় হলে কাঁদতে শুধু চোখের ব্যবহার হয়। এরূপ প্রথমে যে কোন শব্দ শুনে ভয় পেত বড় হলে তেমন থাকে না, হয়ত শিয়ালের ডাক বা সাইরেনকে ভয় করে।

৫। বিকাশের ধারায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ

বিকাশের নিজস্ব ধারা আছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে তার গতি দ্রুত হতে পারে শ্লথও হতে পারে। নিয়ম মাফিক চলে এ বিকাশ। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে থাকে পার্থক্য। যেমন কেউ হাঁটতে শুরু করে দেরীতে কেউ বা যথাসময়ে।

৬। বর্ধন ও বিকাশ পরিণমন ও শিখনের উপর নির্ভরশীল ঃ

পরিণমন এক প্রকার অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি যার সঙ্গে সংগতি রেখে কিছু শেখাতে হয়। পরিণমন নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তি বিশেষ কতটুকু শিখন গ্রহণ করতে পারবে। পরিণমনের পূর্বে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের কোন সার্থকতা নেই।

৭। বিকাশের ধারায় বিচ্ছিন্নতা আছে এবং তাদের মাঝে সমন্বয় আছেঃ

যেমন, ধরুন অনালী গ্রন্থির কথা। প্রতিটি গ্রন্থি তার নিজ নিজ হরমোন তৈরি করে, তাদের কার্যাবলি সম্পন্ন করে আবার তাদের পরস্পরের মাঝে সমন্বয়ও আছে। আমাদের বুদ্ধি, মনোযোগ, আবেগ, প্রেষণা, স্মৃতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে আবার একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

৮। বর্ধন ও বিকাশের কতগুলো গতি আছে ঃ

বিকাশের গতি দু'প্রকার নীতি মেনে চলে। এগুলি হলো :

- **Cephalocaudal Principle**
- **Proximodistal Principle**

মাথা থেকে ধীরে ধীরে পায়ের দিকে বিকাশের গতিকে বলে **Cephalocaudal Principle.** উদাহরণ - প্রথমে শিশু মাথা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে তারপর ধীরে ধীরে দেহ এবং সব শেষে পা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কাছ থেকে দূরের দিকে বিকাশের ধারার সঞ্চালনকে **Proximodistal Principle** বলে। প্রধান প্রধান অঙ্গের কার্যকলাপ দেহের কেন্দ্র হতে দেহের বাইরের দিকে অগ্রসর হয় - যেমন শিশু প্রথমে চোখ, মাথা, ঘাড় এবং পরে বাহু, কনুই ও আঙ্গুল নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

৯। শিশুর জীবনের প্রথম দিকের বিকাশ পরবর্তী বিকাশের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঃ

শিশুর জীবনের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ তার পরবর্তী জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। এটা জীবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশুর জীবনে প্রথম থেকে স্নেহ-ভালবাসা, নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে সে সুসামঞ্জস্য আচরণ প্রদর্শন করে। তার বিকাশ সুষম ও সুস্থ হয়। বিপরীতে অস্বাভাবিক আচরণের প্রাধান্য দেখা দেয়। বড় বড় অপরাধীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের এ অপসংগতির মুলে রয়েছে শৈশবের অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা।

১০। বিকাশের ধারায় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ আছে ঃ

প্রতিটি সমাজে বিশেষ বয়সে বিশেষ কিছু আচরণ করতে হয়, দক্ষতা অর্জন করতে হয়। একে ক্রমবিকাশমূলক কাজ বলে। সুতরাং নির্ধারিত সে কাজগুলি সে বয়সে তার করা দরকার। এ সময়কেই আমরা সন্ধিক্ষণ (Critical Period) বলছি।

- **Maturation (পরিণমন বা পরিপক্কতা) ঃ** পরিণমন বা পরিপক্কতা হচ্ছে ব্যক্তির আস্ড়র্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উম্মোচন (Maturation is the unfolding of the characteristics present in the person) জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশকে পরিণমন

বলা যেতে পারে। শিক্ষা ব্যতিরেকে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশই হচ্ছে পরিণমন। যেমন: বসতে শেখা, দাঁড়াতে শেখা ইত্যাদি। এজন্য কোন শিখন বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না। মনোবিজ্ঞানে এ গুলিকে phylogenetic function বলা হয়। বিপরীতে সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া ইত্যাদিতে শিখন বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ গুলোকে বলা হয় Ontogenetic function।

● পরিণমন ও শিখন ঃ

পরিণমনের অগ্রগতির সঙ্গে শিশুর শিখনের অগ্রগতি হয়। পাঁচ বছর বয়সে পরিণমনের যে স্তরে সে লেখা শিখেছে ঐ বয়সে নিশ্চয়ই সে মটরগাড়ি চালাতে পারবে না। ১৮-২০ বৎসরে তার পক্ষে এটা সম্ভব। অতএব যে বয়সে যে কাজটি তার পরিণমনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সে কাজটি শেখানো উচিৎ।

শিশু কোন বয়সে পরিণমনের কোন স্তরে রয়েছে কিংবা কোন স্তরে কোন কাজটি কতটুকু করতে পারবে সেসব আমাদের জানা দরকার। আমরা যদি সেই পরিস্থিতি শনাক্ত করতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বুঝে শিখনের কাজে এগিয়ে নিতে পারবো। শিক্ষার্থী যদি পরিণমনের কোন স্তরে বিশেষ শিখন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে তবে তাকে সার্থকভাবে শেখানো অসম্ভব। এটা জানার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ ইঙ্গিত করেছেন তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি সেগুলি হলো :

১। শিখন গ্রহণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ (Interest in learning) ।

২। আগ্রহের স্থায়ীত্ব (Sustained Interest) ।

৩। উন্নতি (Improvement) বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করছে কিনা তা লক্ষ্য করা।

● ৬ থেকে ১১/১২ বৎসর বয়সকে বাল্যকাল বলা হয়। এ সময়ে ছেলে ও মেয়েদের বিকাশে পার্থক্য দেখা যায়। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দ্রুত বাড়ে। পরবর্তীতে ছেলেরা মেয়েদেরকে ওজন ও উচ্চতায় অতিক্রম করে। এ সময় শৈশবের কোমলতা ও কমনীয়তা অনেক কমে আসে। ৭-৮ বৎসরে হাতের মাংশপেশী বৃদ্ধির ফলে হাতের আকৃতি দৃঢ় ও প্রশস্ত হয়। পায়ের বৃদ্ধি ও হাতের অনুরূপ হয়। এ সময় সারা দেহের অনুপাতে মাথার

আকৃতি ছোট, মুখ গহ্বর ও চোয়াল বড় হওয়ায় মুখমন্ডলের আনুপাতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। দেহ কান্ডের প্রশস্ততা কমে ও দেহ লম্বাটে হয়।

এ বয়সে পেশী ও বৃহৎ পেশীর গঠন চলতে থাকে। পেশী সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এ সময় তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। দৌড়ানো, লাফানো, ডিগবাজী দেওয়া, গাছে চড়া, এক পায়ে লাফানো ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে। ৭-৮ বৎসর বয়সে ব্যাট ও বলের যোগাযোগ করতে পারে। ছবি আঁকা, কাগজ ও কাপড় কেটে জিনিসপত্র তৈরি করা, সেলাই করা, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদির কাজ করতে সক্ষম হয়।

E. Hurlock ১২ থেকে ২১ বৎসর পর্যন্ত সময়কালকে কৈশোর কাল (Adolescence) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সময় দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি সাধন হয়। এ সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয় অর্থাৎ যৌবন ও বাল্যকালের সন্ধিক্ষণ। এ সময় দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বর্ধন ও বিকাশ ঘ'টে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। বয়ঃসন্ধিকালের শেষের দিকে উচ্চতা পূর্ণতায় পৌঁছায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সতেজ ও সবল হয়, তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ছেলেদের গোঁফ দেখা দেয়। মেয়েদের স্তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুঢৌল হয়। ছেলেমেয়েদের যৌন অঙ্গের বর্ধন ও বিকাশ ঘটে। যৌন গ্রন্থির পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। প্রারম্ভিক কৈশোরে ছেলেমেয়েরা দৈহিক বিকাশের জন্য সংকোচ বোধ করে। যৌন বিকাশের ফলে বয়ঃসন্ধিকালের শেষে মেয়েরা পূর্ণাঙ্গ নারী ও ছেলেরা পূর্ণাঙ্গ পুরুষে পরিণত হয়।

মূল্যায়নঃ

১. বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমন বলতে কী বোঝায়? একটি করে উদাহরণ দিন।

২. দৈহিক ও মানসিক পরিপক্কতার সাথে শিখনের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।

৩. শিক্ষক হিসাবে শিখনের ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে পরিণমনের দিকে লক্ষ্য রাখবেন - আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ

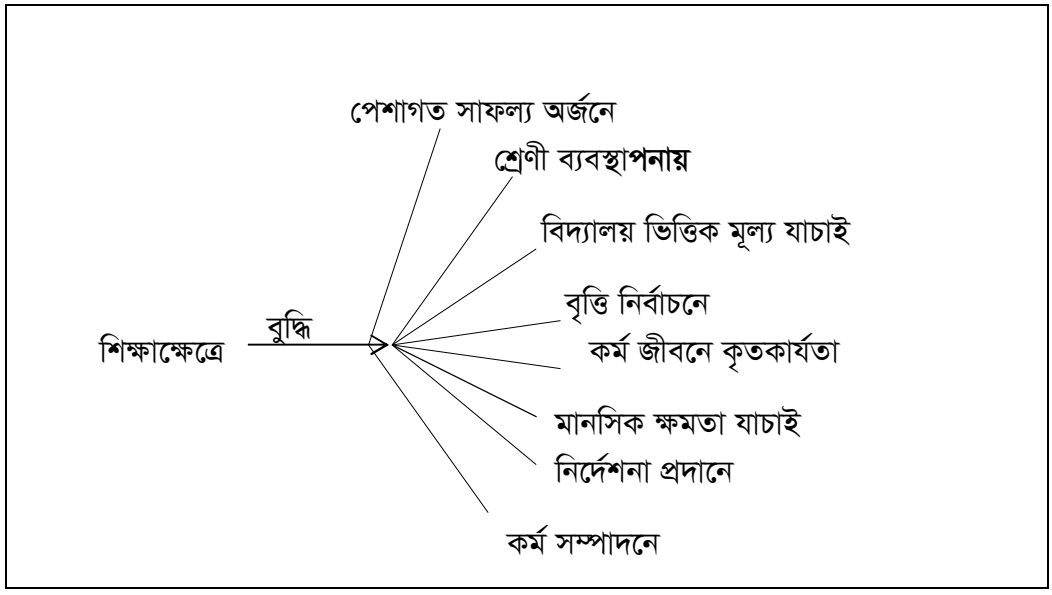

ইউনিট-২ **অধিবেশন-২**

আবেগ ও উদ্বিগ্নতা

(Emotion, Worry & Anxiety)

ভূমিকা

আবেগ একটি আপেক্ষিক বিষয় যা মনের একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আবেগীয় অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বয়সভেদে এ আবেগ আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। একই উদ্দীপকের প্রতি এক এক বয়সে শিশু, বালক ও কিশোর ভিন্ন ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে। যা অনেকাংশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। আবেগের এ ধরনের পরিবর্তনকে "আবেগের বিকাশ'' বলে। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর আবেগের উদ্দীপক ও আবেগিক ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে তাকে **'আবেগীয় বিকাশ'** বলা হয়। অর্থাৎ আবেগ হলো ব্যক্তির একটি আলোড়িত অবস্থা। আবেগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক বহিঃপ্রকাশ। আবেগ মনের একটি বিচলিত অবস্থা। ল্যাটিন Emover থেকে ইংরেজি Emotion শব্দ যার অর্থ হলো প্রক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আবেগীয় অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। অর্থাৎ আবেগের বৈশিষ্ট্য বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ায় শিশুর আবেগের উদ্দীপক ও আবেগিক ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ''আবেগিক বিকাশ"।

আবেগিক বিকাশের পিছনে তিনটি কারণের ভূমিকা বিদ্যমান:

১. চাহিদার তৃপ্তি
২. চাহিদার অতৃপ্তি
৩. নিরাপত্তার অভাব

শৈশব থেকে এ তিনটি কারণে ব্যক্তির মধ্যে আবেগের বিকাশ ও প্রকাশ হতে দেখা যায়। বিভিন্ন মৌলিক ও মিশ্র জটিল আবেগের বিকাশ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি আবেগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এসময় এসব আবেগ প্রকাশে তীব্রতা দেখা যায়। আবেগমূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের অন্য স্তরের ছেলেমেয়েদের

চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য দেখায়। এ বয়সে সবরকম আবেগের বিকাশ হয়। আবেগিক আচরণের প্রকাশ কোন কোন সময় খুব বেশি হয়। আবার কোন কোন সময় একদম থাকে না। যেমন: কোন কোন সময় আনন্দ খুব তীব্রভাবে প্রকাশ করে; আবার এমন বিমর্ষ হয়, যে কোন সময়ে আনন্দিত হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না। এছাড়া মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন রীতি পরিবর্তন হয়। গলার স্বরের পরিবর্তন হয়, চক্ষু গোলকের নাড়াচাড়ায় পরিবর্তন হয়, মুখের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়, হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের পরিবর্তন হয়, রক্ত চাপের তারতম্য ঘটে, মস্তিস্কের ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ আবেগগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- আবেগকালীন শরীরিক পরিবর্তন এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ আবেগ চিহ্নিতকরণ

আবেগ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। যা মনের একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আবেগিয় অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যা আশা করে তা পেলে খুশী হয় আর না পেলে দুঃখ পায়। আবার কোন কিছুর ভয়ে ভীত হওয়া, নিরাপত্তার অভাববোধ করা। ব্যক্তিসত্তার বিকাশে কোন কিছু প্রকাশে অনিহা প্রকাশ করা। ফলে অগ্রসরতার ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে থাকে। মানসিক তাড়নার বশবর্তী হয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আবেগ সৃষ্টি হয়। যা কর্মপ্রবণতা পরবর্তী পর্যায়ে দৈহিক আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিশুদের আচরণগত দিক ও মনোভাব বিচার করুন। আসুন আমরা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ আবেগিয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

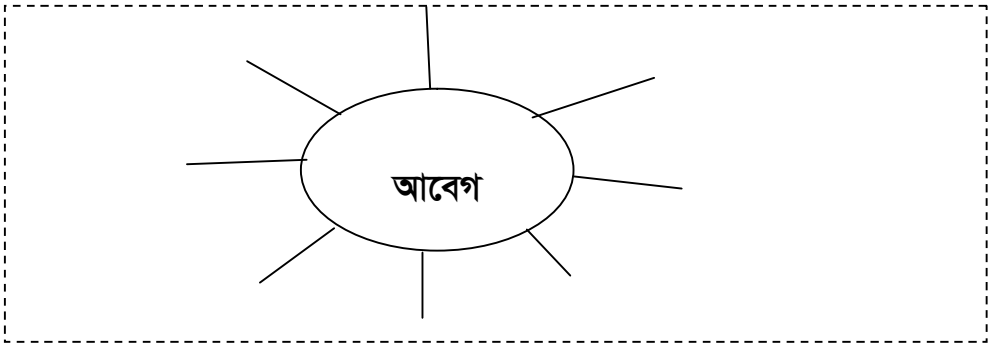

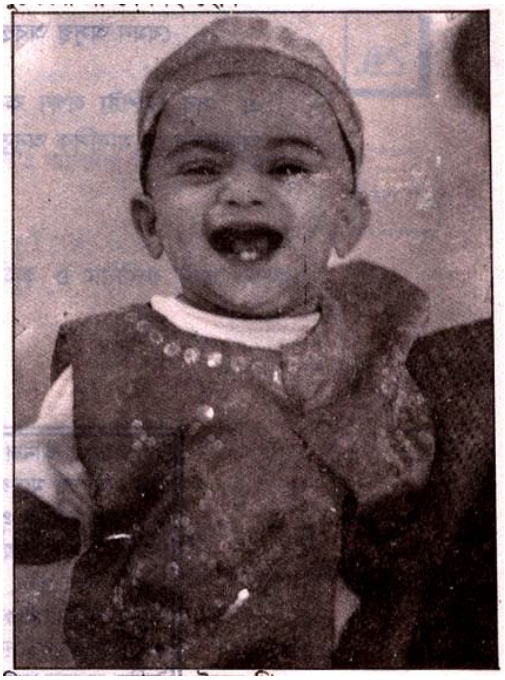

আনন্দে উচছল শিশু

শিশুর কৌতুহল

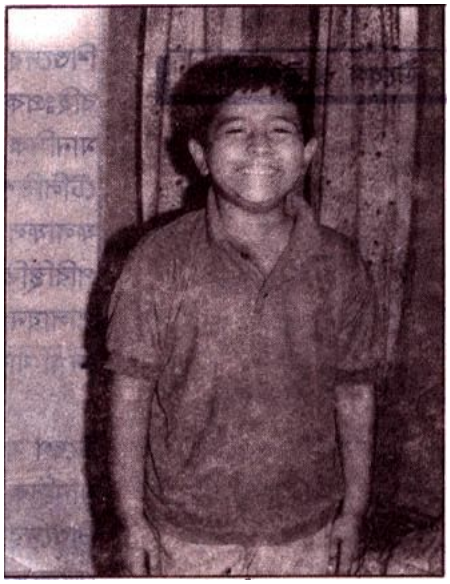

বাল্যে আনন্দ আবেগ প্রকাশ

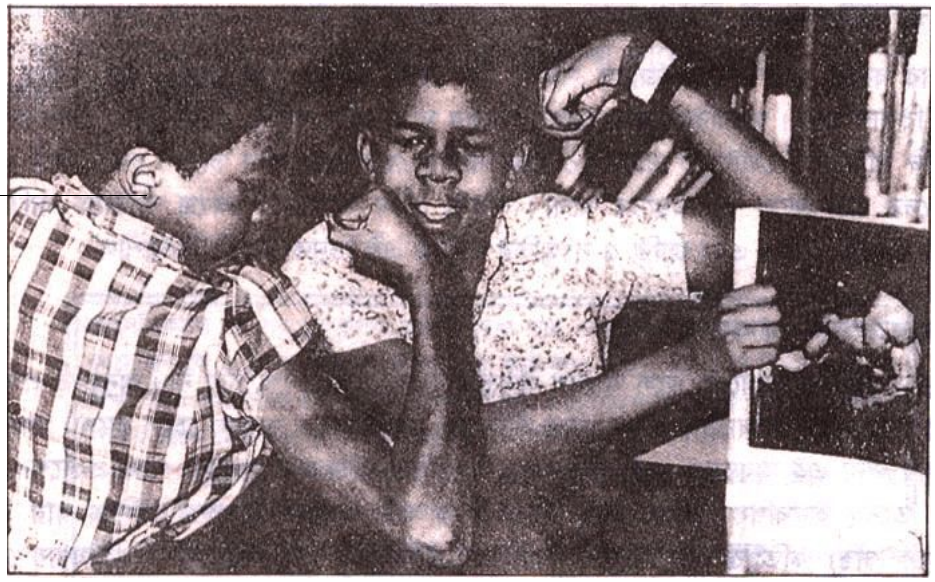

কিশোর বয়সী ছেলেরা নিজেদের জাহির করতে চায়

পর্ব-খঃ আবেগের সময় শরীরের যে যে পরিবর্তন হয় এবং এর বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব জগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের যে ধারণা জন্মে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জন্য প্রয়োজন আবেগ বা Emotion। তাই বস্তুর প্রত্যক্ষণের সঙ্গে শুধুমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা হয় তা নয়, একটা আন্তরিক অবস্থারও সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির এ আন্তরিক অবস্থাকে অনুভূতি বলা হয়। সুতরাং আবেগও অনুভূতির মত একটি আন্তরিক অবস্থা, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে

দেহযন্ত্রের মাধ্যমে। অর্থাৎ আবেগ মনের একটি বিচলিত অবস্থা। যার অর্থ হল প্রক্ষুব্ধ হওয়া বা উত্তেজিত হওয়া। সুতরাং আবেগ বলতে আমরা মনের সেই স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থাকে বুঝি যা ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে।

তাই আবেগের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য মানসিক অবস্থা থেকে পৃথক করে রেখেছে। অনুভূতি হল খুব মৃদু দুর্বল মানসিক অবস্থা। সে অনুভূতি যখন প্রবল আকারে প্রকাশ পায় এবং আমাদের দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তখন তাদের আমরা আবেগ বলি। যার বৈশিষ্ট্য হল -

- আবেগ সৃষ্টি করার জন্য একটি উদ্দীপক প্রয়োজন।
- আবেগ পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণা থেকে আসতে পারে।
- আবেগ প্রকাশে দু'ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন- উপস্থাপন ও পুন:রুত্থান।
- আবেগ বিভিন্ন ধরনের আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।
- আবেগের সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।
- মনের অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

আবেগের সঙ্গে কিছু না কিছু দৈহিক পরিবর্তন হয়। এর আবার দুটো দিক রয়েছে, দৈহিক ও মানসিক দিক। আবেগের সময় শারীরিক পরিবর্তনের ফলে দেহের অভ্যন্তরে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) হয়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগিয় প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন হয়। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক সংস্কারের প্রভাবে আবেগিয় প্রতিক্রিয়া ক্রমশ জটিল হতে থাকে। তবে এটি পরিবর্তনশীল এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। কারণ আবেগ ব্যক্তির মানসিক আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আবেগ কোন বিশেষ বস্তু বা অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের মানসিক অনুভূতির বহি:প্রকাশ মাত্র। ওয়াটসন (Watson) বলেছেন, "মানুষের মৌলিক আবেগ মাত্র তিনটি: ভয় (Fear), ক্রোধ (Anger) এবং ভালবাসা (Love)"। সুতরাং আবেগ বংশগত প্রক্রিয়া নয় বরং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো একটা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচের শব্দগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন, চিন্তা করুন এবং নিচের ছকে কাজ-১ এবং কাজ-২ এর ঘরগুলো পূরণ করুন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় এবং সম্ভাব্য উত্তর দেখে নিন।

কৌতূহল	ঘৃণা,	আনন্দ,	ভয়,
রাগ,	ভালবাসা,	হিংসা,	উল্লাস,
বিরক্তি,	হর্ষ,	দুঃখ,	ক্রন্দন,
হাসি,	সহানুভূতি,	বিস্ময়,	হীনমন্যতা,
স্বাধিকারবোধ,	লজ্জা,	আমোদ,	উদ্বেগ,
উৎকণ্ঠা।			

কাজ-১

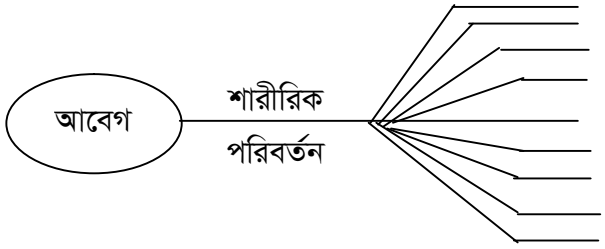

কাজ-২

পর্ব-গঃ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা চিহ্নিতকরণ

শৈশব ও বাল্যের সুপ্রতিষ্ঠিত আবেগের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এগুলো এক ধরনের ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং কাল্পনিক ভয় থেকে এসব উদ্বেগের (Worry) সৃষ্টি হয়। যা মানসিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে থাকে। পরিবারের কোন পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থান, বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষে যে কোন সমস্যা উদ্বেগের সৃষ্টি করে। যা শারীরিক ও মানসিক প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন- বিদ্যালয় পলায়নপরতা, যে কোন যোগাযোগে ব্যর্থতা বা এড়িয়ে যাওয়া, মুখমন্ডল বিবর্ণ হওয়া, ক্ষুধা নষ্ট হওয়া, অনিদ্রা ইত্যাদি।

উদ্বেগ যখন অতিমাত্রায় হতে থাকে তখন তা উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। দুশ্চিন্তা থেকেও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি উৎকণ্ঠায় ভোগে। দিবা স্বপ্ন, অসুস্থতা, নিরাপত্তাহীনতা, বিদ্রোহী ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎকণ্ঠার বহি:প্রকাশ ঘটে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন প্রদত্ত ছবিগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করি এবং ছবিগুলো থেকে উৎকণ্ঠার প্রভাবগুলো চিহ্নিত করি।

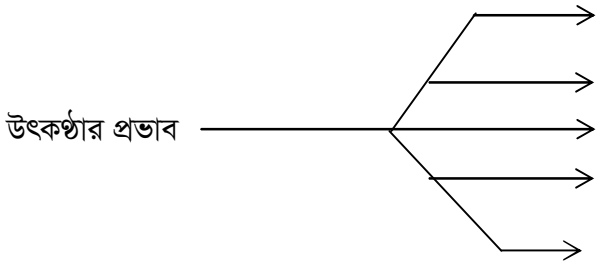

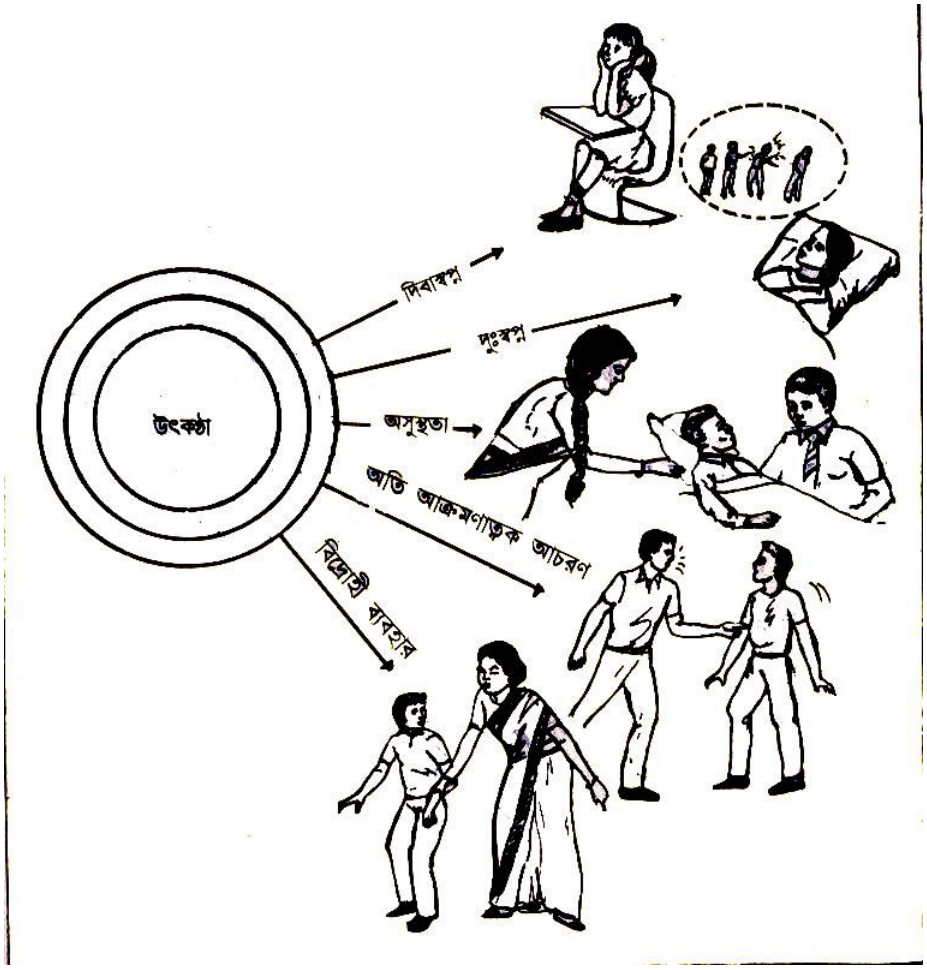

ছেলে মেয়েদের উপর উৎকণ্ঠার প্রভাব

ইউনিট-২ অধিবেশন-২

মূল শিখনীয় বিষয়

আবেগ ও উদ্বিগ্নতা

- **আবেগ (Emotion)**

আমাদের মনের অনুভূতি আর তার দৈহিক প্রকাশ নিবিড়ভাবে জড়িত। আমরা আনন্দে উল্লাসিত হই, ভয়ে ভীত হই, রাগে উত্তেজিত হই, দুঃখে বিমর্ষ হই- এই যে আনন্দ, রাগ, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি এগুলিই আবেগ। কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ফলে আমাদের দেহ মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার ফলে কান্না, হাসি, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অনুভব করি, আর প্রকাশ করি, এগুলোই আবেগ। উডওয়ার্থ ও মারকুইস বলেন "আবেগ হলো ব্যক্তির একটি আলোড়িত অবস্থা"।

আবেগ অনুভূতির সঙ্গে সংশিষ্ট কিন্তু আবেগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক বহি:প্রকাশ। আবেগ মনের একটি বিচলিত অবস্থা। এটা "Stirred up state of agitation". ল্যাটিন Emover থেকে ইংরেজি Emotion শব্দ এসেছে যার অর্থ হলো প্রক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। তাই বলা যায় আবেগ হল মনের সেই স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশমান অবস্থা যা ব্যক্তিকে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে। যখন কোন ব্যক্তি আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে দেহ মনে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তার স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

আবেগ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেগুলোকে সংজ্ঞা আকারে তুলে ধরা হল:

১। "বস্তুর প্রত্যক্ষণ জীবে যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি করে তাই হলো আবেগ।" - জেম্‌স

২। "আমাদের আচরণ ও চিন্তার মূলে রয়েছে কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সাথে জড়িত রয়েছে একটি করে আবেগ।" - ম্যাগডুগাল

৩। "আবেগ হল একটি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা যা শরীরকে উজ্জীবিত করে এবং অভিজ্ঞতা লাভকারীর নিকট যার অর্থ ও মূল্য রয়েছে।"- জন সি. রাচ (১৯৮৪)

▪ আবেগের বৈশিষ্ট্য

প্রাণীর আবেগের কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অতি সহজেই প্রাণীর অন্যান্য মানসিক অবস্থা হতে আবেগকে পৃথক করে। এখানে আবেগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

- আবেগ জাগানোর জন্য উদ্দীপক প্রয়োজন। পরিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে অনেক আবেগ তৈরি করে। কোন ব্যক্তির অশোভন আচরণে আমরা রেগে যেতে পারি। তেমনি কষ্টকর কোন অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণ করে কাঁদতে পারি।

- আবেগের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কের জন্য অনুভূতি ও আবেগ দু'টো পৃথক হয়েছে। আবেগের সঙ্গে কম বেশি শারীরিক পরিবর্তন হবেই। যেমন - ক্রন্দনের সময় চক্ষু দিয়ে পানি ঝরা।

- আবেগের বৈশিষ্ট্য স্থায়ীত্ব - এটি মনের মাঝে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে। এটি জীবের মাঝে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। - হঠাৎ আমরা রেগে যাইনা আবার হঠাৎ রাগ থেমে যায় না।

- আকাঙ্খার সঙ্গে আবেগ জড়িত - কোন প্রবল ইচ্ছা বা আকাঙ্খাকে জোর করে অবদমন করলে আবেগ সৃষ্টি হয়।

- অনেক সময় দৈহিক অবস্থা থেকে আবেগ সৃষ্টি হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে আবেগের প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটে। যেমন - বাল্য বয়সে যে কারণে হাউ মাউ করে ক্রন্দন করতে দেখা যায় সে একই কারণে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা তেমন করে ক্রন্দন করে না।

- আবেগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল - এটি ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে থাকে। যেমন: কোন ব্যক্তির যদি খুব মাথা ধরে তখন কেউ অতিরিক্ত কথা বললে খুব রাগ হয়।

- আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী জেমস (James) এবং ডেনমার্কের ল্যাংগের মতে উদ্দীপকের উপস্থিতিতে দৈহিক পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে প্রক্ষোভের (আবেগ) অনুভূতি সৃষ্টি হয়। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে -

উদ্দীপক $\rightarrow$ দৈহিক পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া $\rightarrow$ প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি।

■ আবেগের শ্রেণী বিভাগ

McDugall মানুষের আবেগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ (Primary Emotion) ঃ সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আবেগগুলোকে মৌলিক আবেগ বলা হয়েছে। তার মতে মৌলিক আবেগ ১৪টি যথা ঃ ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, স্নেহানুভূতি, কাম, বিস্ময়, হীনমন্যতা, আত্মগৌরব, একাকীত্ববোধ, স্বাধিকারবোধ, সৃজনীস্পৃহা, আমোদ, ক্ষুধা ও দুস্থভাব। সকল প্রবৃত্তি যেমন জন্মের সময় থাকে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় তেমনি কিছূ কিছু মৌলিক আবেগ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

(২) জটিল আবেগ (Secondary or Complex emotion) ঃ অনেক সময় দুই বা তার বেশি প্রবৃত্তি এক সঙ্গে জাগে ফলে দুই বা তার বেশি আবেগ একত্র হয়ে যে আবেগমূলক অবস্থা সৃষ্টি হয়- তাকেই ম্যাকডুগাল মিশ্র বা জটিল আবেগ বলেছেন।

যেমন ঃ কৃতজ্ঞতা হলো মমতা ও হীনমন্যতার মিশ্রন।
ঘৃণা হলো ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রন।

(৩) অর্জিত আবেগ (Derived Emotion) ঃ প্রাথমিক ও মিশ্র আবেগ ব্যতিত ম্যাগডুগাল আর এক ধরনের আবেগের কথা বলেছেন যা হচ্ছে অর্জিত আবেগ, যেগুলোর সঙ্গে প্রবৃত্তি বা কর্ম প্রবণতার কোন মিল নেই।

যেমন ঃ বিবাদ, উল্লাস, আশা, আশংকা ইত্যাদি।

■ আবেগের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে ঃ

এ গুলো দু'প্রকার ঃ (ক) বাহ্যিক পরিবর্তন ও (খ) অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

(ক) বাহ্যিক পরিবর্তন ঃ আবেগকালীন সময়ে আমাদের আচরণে অনেক পরিবর্তন ঘটে, এগুলোকে আবেগকালীন আচরণ বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ আবেগের সময় বাহ্যিক আচরণের যে সব পরিবর্তন আসে সেগুলো হলো ঃ

- মুখ ভঙ্গির পরিবর্তন ঃ মনের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব ও ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। বিশেষ বিশেষ মুহুর্তের মানসিক অবস্থা মুখে প্রতিফলিত

হয়। আবেগের সময় ঠোঁট নাক কপাল ও চিবুকের বিভিন্ন পেশীতে পরিবর্তন হয়।

- অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের পরিবর্তন ঃ আবেগের সময় বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নড়াচাড়া সাধারণ নিয়মে হয় না। রাগের সময় আমরা জোরে হাত পা নাড়াচাড়া করি। যখন দুঃখ পাই তখন চুপচাপ বসে থাকি।
- গলার স্বরের পরিবর্তন ঃ ভয়, আনন্দ, বিস্ময় ইত্যাদি আবেগে বিভিন্ন রকম ধ্বনি হয়, গলার স্বরে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। গলার স্বর শুনে হাসছে না কাঁদছে, বিস্মিত না আনন্দিত না দুঃখিত হয়েছে তা সাধারণ ভাবেই বুঝা যায়।
- চোখের তারার পরিবর্তন ঃ আবেগের সঙ্গে চোখের সম্পর্ক নিবিড়। আবেগের সাথে সাথে চোখের তারা কখনও বড় কখনও ছোট হয়। যেমন- বিস্ময়ে আমাদের চোখ বড় বড় হয়ে যায়।
- শ্বাস প্রশ্বাসের পরিবর্তন ঃ আবেগের সময় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়।
- চেহারার পরিবর্তন ঃ যেমন - যখন হাসি দেয় তখন মুখমন্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে - ইত্যাদি।

(খ) অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঃ আবেগকালীন সময়ে দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরেও অনেক পরিবর্তন হয়। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো -

* হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধি ঃ সুস্থ অবস্থায় যে হৃদস্পন্দন মিনিটে ৮৪ বার, বিশেষ আবেগের সময়ে তা বেড়ে গিয়ে মিনিটে ১০৪ বারে দাঁড়াতে পারে।
* রক্তচাপের পরিবর্তন ঃ হৃদস্পন্দন বাড়ার সঙ্গে ব্যক্তির রক্তের চাপও বেড়ে যায়। যেমন - অত্যাধিক ক্রোধে রক্তের চাপ বেড়ে যায়।
* নাড়ীর স্পন্দন পরিবর্তন ঃ নাড়ীর গতির হারেও পরিবর্তন আসে। ভয়ে কারো নাড়ীর গতি খুব দ্রুত হয় আবার অনেক সময় নাড়ীর বেগ কমে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়।
* ত্বকের রাসায়নিক তড়িৎ প্রবাহের গতি ঃ মানুষের ত্বকে তড়িৎ পরিবাহী ক্ষমতা আছে। আবেগের সময় এ ক্ষমতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষমতাকে বলা

হয় Galvanic Skin Response বা Reflex (G.S.R.).G.S.R. নির্ণয়ের জন্য রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী লুরিয়া একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন যাকে মিথ্যা নির্ণয়ক যন্ত্র বা খরব Detector বলা হয়। এর সাহায্যে উন্নত বিশ্বে অপরাধীদের মিথ্যা সওয়াল নির্ণয় করা হয়ে থাকে। পুরুষের চাইতে মহিলারা বেশি আবেগ প্রবণ বলে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের G.S.R. অনকে বেশি হয়।

* মস্তিস্ক তরঙ্গের পরিবর্তন ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্কের আলফা তরঙ্গের আবর্তন হয় প্রতি সেকেন্ডে ৮-১২ বার। কিন্তু তীব্র আবেগের সময় প্রতি সেকেন্ডে মস্তিস্কে তরঙ্গের আবর্তন হয় ১২ বারের অনেক বেশি। যেমন - ভয়ে কাঁপতে থাকা।

- **ব্যক্তি জীবনে আবেগের ভূমিকা ঃ** মানব জীবনে আবেগের প্রভাব অসামান্য। যদিও মনে করা হয় মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানব জীবনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান। পৃথিবীর বড় বড় ঘটনা - দূর্ঘটনা যেমন ট্রয়ের যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, বাবরী মাসজিদ ধ্বংস ইত্যাদির পিছনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান ছিল। মনোবিদ রস বলেন "দুটো বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত প্রক্ষোভ মানুষের জীবনে কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে।" আবেগ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, এবং যেকোন আবেগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সী ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা তীব্র আবেগের ব্যক্তি তার বিচার বিবেচনা, বিবেক - বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে না। নিজের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আবেগের ফলে মানসিক অস্থিরতা থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। অতএব আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ অত্যন্ত জরুরি।

▪ আবেগিক বিকাশ

শিশু যত বড় হতে থাকে তার মানসিক আবেগিক অভিব্যক্তির মধ্যে নানা বৈচিত্র ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিশুর কাজে বাঁধা দিলে, তাকে বকা দিলে, তার খেলনা কেড়ে নিলে বা শিশু যা চায় তা না পেলে শিশু রেগে চিৎকার করে কাঁদে, মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় ও হাত পা

ছোড়াছুড়ি করে। ৭/৮ বছর বয়সে সে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে আর আবেগিক বিকাশ যাতে স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা দরকার। শিশু অনেক সময় ভয়, লজ্জা, নিন্দা ও সমালোচনার ভয়ে আবেগকে প্রকাশ না করে জোর করে দমিয়ে রাখে। আবেগকে জোর করে দমিয়ে রাখা সমীচীন নয় এতে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মনের একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক। জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আবেগীয় অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এক এক বয়সের আবেগের বৈশিষ্ট্য এক এক রকম। একই উদ্দীপকের প্রতি এক এক বয়সে অর্থাৎ শিশু, বালক, কিশোর ভিন্ন ভিন্ন রকম আচরণ প্রদর্শন করে। তার আবেগের এই যে পরিবর্তন এটাকেই আবেগের বিকাশ বলা হয়। আমরা বলতে পারি :

'যে প্রক্রিয়ায় শিশুর আবেগের উদ্দীপক ও আবেগিক ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় আবেগিক বিকাশ।' বয়স, অভিজ্ঞতা, পরিণমন ও শিক্ষা আবেগিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।

- **জীবনের যে কোন স্তরে আবেগিক বিকাশের পিছনে তিনটি কারণ ঃ**

  - চাহিদার তৃপ্তি ঃ যেমন- চাকুরির জন্য সাক্ষাৎকার দিয়ে আসার পর নিয়োগ পত্রটি পেয়ে আনন্দ উচ্ছাস।
  - চাহিদার অতৃপ্তি ঃ যেমন - মেডিকেল কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিমর্ষ হওয়া বা ক্রন্দন করা।
  - নিরাপত্তার অভাব ঃ যেমন - পছন্দের মোবাইল সেটটি চুরি হয়ে যাওয়ায় দুঃখ পাওয়া।

শৈশব থেকে এ তিনটি কারণে ব্যক্তির মধ্যে আবেগের বিকাশ ও প্রকাশ হতে দেখা যায়। বিভিন্ন মৌলিক ও মিশ্র জটিল আবেগের বিকাশ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে।

শৈশবকাল

প্রতিটি শিশু জন্মের সময়ে তৃপ্তিদায়ক ও অতৃপ্তিকর এ দু'টি অনুভূতিমূলক আবেগিক উপাদান নিয়ে আসে। যে পরিবেশে সে অবস্থান করে তার কিছু তাকে আনন্দ আর ব্যক্তিগত তৃপ্তি দান করে, কিছু তাকে অসুখী করে। আবেগ ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যা তার আচরণকে

প্রভাবিত করে। শিশুর আবেগ সব সময়ই কোন না কোন দৈহিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন, খুশীতে হাসা। এ ধরনের আচরণ মানুষের সব বয়সে একই রকম থাকে না। তাছাড়া যে সব উদ্দীপক প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করে সময়ের সাথে সে সব উদ্দীপকের প্রভাবের পরিবর্তন ঘটে। যেমন শিশুরা বিড়াল দেখে ভয় পায় কিন্তু বড় হলে সে ভয় থাকে না। বয়সের সাথে আবেগজনিত আচরণের পরিবর্তন হয়।

জন্মের সময় শিশুর মধ্যে চার ধরনের আবেগিক ক্রিয়ার ক্ষমতা দেখা যায়- ভয়, রাগ, ভালবাসা ও ঘৃণা। শিশুদের আবেগমুলক প্রতিক্রিয়া বড়দের মত নয়।

শিশুর আবেগের বৈশিষ্ট্য

- শিশুর আবেগ খুব তীব্র
- শিশুর আবেগের স্থায়ীত্ব কম
- শিশুর আবেগমূলক আচরণ পরিবর্তনশীল
- শিশুর প্রতিক্রিয়ার বিকাশে সামগ্রিক থেকে বিশেষ আবেগে সূচিত হয়
- শিশুর আবেগের মাত্রার পরিবর্তন হয়
- শিশুর আবেগের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্নতা আছে
- শিশুর আবেগিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ

দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে আবেগিক ক্রমবিকাশ ঘটে। আবেগের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয়। শিশুর প্রাথমিক আবেগিক আচরণ তার মা যিনি তাকে সারাক্ষণ দেখাশোনা করেন তাকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করে থাকে। কারো মতে শিশুর প্রথম নির্দ্দিষ্ট আবেগিক আচরণ হলো পরিচিত মানুষের মুখ দেখে হাসা। পরে এই নিরব হাসি উচ্চ হাসির রূপ গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানী ক্যাথরিন ব্রিজেসের মতে আবেগের ক্রমোবিকাশ ঃ

জন্ম কাল	সাধারণ উত্তেজনা	
৩ মাস	অস্বাচ্ছন্দ	আনন্দ
৪ মাস	রাগ	
৫ মাস	বিরক্তি	
৬ মাস	ভয়	হর্ষ
৯ মাস		বড়দের প্রতি ভালবাসা
১২ মাস		
১৫ মাস	হিংসা	ছোটদের প্রতি ভালবাসা
১৮ মাস		
২১ মাস		উল্লাস

দু'বছর পর শিশুর আবেগ পরিবারকে ছাড়িয়ে বিস্তৃত পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গী সাথীদের প্রতি ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদিরও বিকাশ ঘটে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আবেগ প্রকাশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শিশু যত পরিণত হয় তত তার বাহ্যিক প্রকাশের তীব্রতা কমে এবং আচরণ সংযত ও মার্জিত হয়ে উঠে। যেমন : ৪/৫ বছর বয়সে রেগে গেলে চিৎকার দিয়ে কাঁদে, হাত পা ছুড়ে , ৭/৮ বছর বয়সে তেমন করে না।

বাল্যকাল

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করে। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের আনন্দ ধরনের আবেগ বেশি দেখা যায়। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা চিন্তা-ভাবনা মুক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে আনন্দ, উল্লাস, হাসি-খুশি ভাব বেশি পরিমান দেখা যায়। আশংকা, রাগ, ভয় ইত্যাদি আবেগও থাকে। শিশুসুলভ ভয়ের পরিবর্তে তাদের মধ্যে বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা যায়। এ বয়সে বাবা মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় ছোট ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হয়। আবার বাবা মার শাসনের ফলে ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং বিরূপ আবেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালের আবেগ ঃ

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মৌলিক ও মিশ্র জটিল আবেগের বিকাশ হতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি আবেগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে এসব আবেগ প্রকাশে তীব্রতা দেখা যায়। আবেগমূলক বৈশিষ্ট্যের দিক খেকে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অন্য স্তরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য দেখায়। এ বয়সে সবরকম আবেগের বিকাশ হয়। আবেগিক আচরণের প্রকাশ কোন কোন সময় খুব বেশি হয়। আবার কোন কোন সময় একদম থাকে না। যেমন: কোন সময় আনন্দ খুব তীব্র ভাবে প্রকাশ করে; আবার এমন বিমর্ষ হয়, সে যে কোন সময়ে আনন্দিত হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না।

এ বয়সে নিম্নরূপ বিষয়গুলো প্রকাশ পায় :

১. বন্ধুত্ব
২. রাগ
৩. ভয়

৪. আশংকা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব
৫. বিমূর্ত ধারণাকেন্দ্রিক আচরণ
৬. অন্তর্মুখিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা
৭. আদর্শ গঠন
৮. দুশ্চিন্তা
৯. প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা
১০. যৌন আবেগ
১১. আবেগের অবদমন ও
১২. আনন্দ

অন্তক্ষরা গ্রন্থি ও যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্য বা মানসিক স্থৈর্যের অভাব দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে ও বাইরে বন্ধুত্বের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ছেলেরা ছেলে বন্ধু ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পছন্দ করে। বিশেষ একজনকে নয় দলকেই বেশি পছন্দ করে। বন্ধুদের কাছে মনের কথা বলার মধ্যে আছে নিজের মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্তি ও সংঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি।

দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন ও যৌন চাহিদার চাপে বয়:সন্ধিকালে সংশয়ের সঙ্গে অপরাধী মনোভাব দেখা দেয়। লজ্জাভাব, ভয়, অপরাধবোধ ইত্যাদি আবেগ যৌন আচরণের সঙ্গে নতুন রূপ নেয়। হীনমন্যতার অনুভূতি, কোন কোন সময়ে আক্রমনাত্বক ভাব, কোন সময় মনমরা ভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এ বয়সে বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা জন্মে বলে বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। নৈতিক সেন্টিমেন্টের বিকাশও এ স্তরে হয়। এ বয়সে দেহের আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি ও মানসিক ক্ষমতার পূর্ণতা লাভ এ সব মিলে কৈশোরে একটি বিপ্লব ঘটে যায়। শৈশব ও বাল্যের সুপ্রতিষ্ঠিত আবেগের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নিজের বহুমুখী পূর্ণতা উপলব্ধি করে বিপুল আনন্দ পায়। আবার তার সামর্থ ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের অবহেলা ও উদাশীনতা তাদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে তারা অন্তর্মুখী (Introvert) বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠে এবং অনমনীয়তা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। এ বয়সটি আদর্শ গঠনের সময়। এখন তারা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, সুনীতি-দূর্নীতি, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে এবং সঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এবয়সে মূল্যবোধ ও আদর্শের সংঘাত দেখা দেয়।

- **লজ্জা , উদ্বেগ (Worry) উৎকণ্ঠা (Anxiety)**

এগুলো এক ধরনের ভয়েরই বহি:প্রকাশ। বাল্যকালে এ সব ভয়ের সূত্রপাত হয়। কাল্পনিক ভয় থেকে উদ্বেগের (Worry) সৃষ্টি হয়। মানসিক বিকাশের সাথে সাথে শিশুমনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় । স্কুলের কোন সমস্যা, পরিবারের কোন পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। উদ্বেগের বিভিন্ন বহি:প্রকাশ দেখা দেয় - পলায়নপরতা, ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া, মুখমন্ডল বিবর্ণ হওয়া, ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

উদ্বেগ যখন অনেক বেশি ও তীব্র হতে থাকে তখন উৎকণ্ঠায় (Anxiety) পরিণত হয়। মানসিক ভয় বা মনের বেদনাদায়ক দুশ্চিন্তা থেকেও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। সমবয়সীরা যে সব শিশুদের গ্রহণ করে না, এরূপ প্রত্যাখ্যাত শিশুদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বেশি দেখা দেয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা উৎকণ্ঠায় বেশি ভোগে। দিবা স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, অসুস্থতা, অতি আক্রমনাত্বক ব্যবহার, বিদ্রোহী ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎকণ্ঠার বহি:প্রকাশ ঘটে। লাজুকতা সামাজিক ভয় থেকে সৃষ্টি হয়। এ সময় শিশুরা চুপ করে থাকে। হাতে কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করে বা দাঁত দিয়ে নখ কাটে।

মূল্যায়নঃ

১. আবেগ বলতে কী বোঝায়?

২. আবেগের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের সম্পর্ক উল্লেখ করুন।

৩. আচরণিক বিকাশের কারণগুলো উল্লেখপূর্বক আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

ব্যক্তি যা আশা করে তা পেলে খুশী হয়, না পেলে দুঃখ পায়, কোন কিছুর ভয়ে ভীত হয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আবেগ সৃষ্টির পেছনে (ক) চাহিদার তৃপ্তি (খ) চাহিদার অতৃপ্তি এবং (গ) নিরাপত্তার অভাব কাজ করে। এ তিনটিকেই আবেগ সৃষ্টির কারণ বলা হয়।

পর্ব-খ, কাজ-১

রাগের সময় শিশুরা হাত পা ছুড়াছুড়ি করে, আনন্দে অট্ট হাসি দেয়; বয়স্কদের মুখমন্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে, চোখ বড় দেখায়, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়। এগুলো তাদের বাহ্যিক আচরণিক পরিবর্তন। তেমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় রাগের সময় নাড়ির স্পন্দন বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ হৃদপিন্ডের ক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায় এর ফলে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। এগুলি শারীরিক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।

পর্ব-খ, কাজ-২

শিশু আবেগের বৈশিষ্ট্য : খুব তীব্র এ আবেগের স্থায়ীত্ব কম, আবেগের আচরণ পরিবর্তনশীল, আবেগের মাত্রা পরিবর্তন হয়, আবেগের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্নতা আছে, শিশুর আবেগিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ। আবেগের ফলে মানসিক অস্থিরতা থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব , উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। কারণ মনের একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। তাই এক এক বয়সের আবেগের বৈশিষ্ট্য এক এক রকম এবং তা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। আবেগের এ ধরনের পরিবর্তনকে আবেগের বিকাশ বলা হয়।

পর্ব-গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৩**

আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগ

ভূমিকা

জীবের জীবনে আবেগ প্রবণতা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যা এক বিশেষ আচরণিক অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাই বলা হয় মানুষ চিন্তার চেয়ে আবেগ দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়। মানুষ তার আবেগকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের সকল কর্মতৎপরতা আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবেগের ইংরেজি প্রতিশব্দ Emotion, এসেছে Latin শব্দ Emovere হতে। যার ইংরেজি রূপক শব্দ হলো To move out। জীবের আবেগ তার তীব্র মানসিক অনুভূতির মধ্য দিয়ে দৈহিক সক্রিয়তায় প্রকাশ পায়। আবেগিক অবস্থা প্রক্ষুদ্ধ হতে পারে, বিষাদময় হতে পারে, আবার আনন্দ উল্লাসময় হতে পারে। আবেগ সহজাত প্রবৃত্তিভুক্ত। সুতরাং জীব বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে শারীরিক, মানসিকভাবে যে উত্তেজিত অবস্থায় উপনীত হয় তাকেই আবেগ (Emotion) বলা হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মানব জীবনে আবেগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে কী করণীয় তা ব্যক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : মানব জীবনে আবেগের ভূমিকা

মানব জীবনে আবেগের প্রভাব যে অত্যন্ত বেশি তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, "আবেগ হলো ব্যক্তিনিষ্ঠ দৈহিক ও মানসিক প্রকাশভঙ্গির একটি জটিল ও আলোড়িত অবস্থা। ব্যক্তিক আচরণ এবং চিন্তার মূলে রয়েছে কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রতিটি

প্রবৃত্তির সাথে জড়িত রয়েছে একটি করে আবেগ। Woodworth & Marquis বলেছেন, "Emotion is a moved or stared up state of the individual". পরিশেষে বলা যায়, প্রতিটি জীবের আবেগের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দৈহিক, মানসিক পরিবর্তন এবং উদ্দীপকের তীব্রতা বিদ্যমান থাকে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা মানব জীবনে আবেগের ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করি-

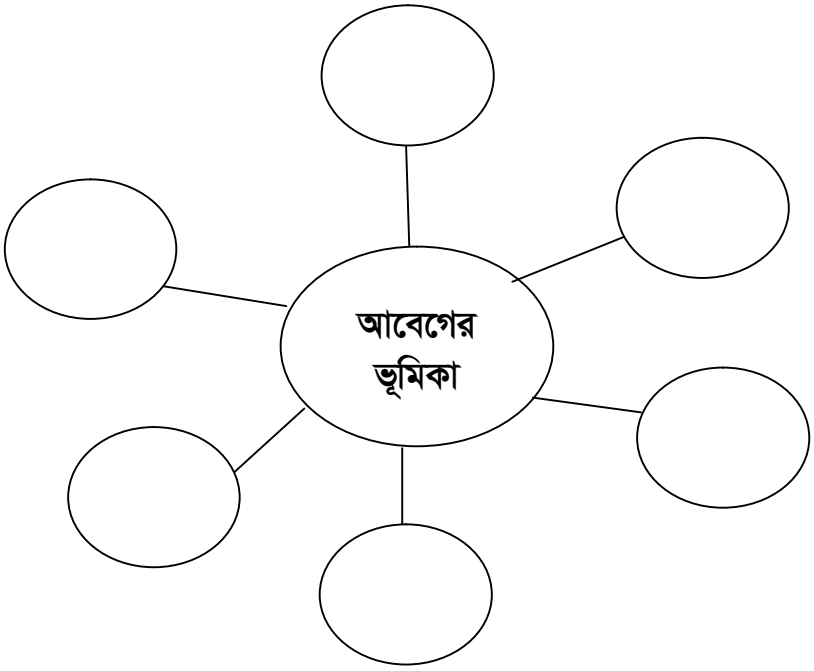

পর্ব-খ : আবেগ নিয়ন্ত্রণ

আবেগ ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করায়। আবেগিক সমতা ব্যক্তির গঠনমূলক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে, ব্যক্তির জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি বজায় রাখে। আবেগের অভিব্যক্তি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কেউ সামান্য কারণে রেগে যায়, কেউ রাগ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকের উপস্থিতিতে নির্বিকার, শান্ত ও স্বাভাবিক থাকে। কেউ সামান্য কারণে ভীত ও উত্তেজিত হয়। অর্থাৎ আবেগ সবসময় উদ্দীপককে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়ে থাকে। উদ্দীপক নির্ভরতা আবেগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সুন্দর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেগিক নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। কারণ আবেগিক অস্থিরতা গৃহের ও পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে। অন্যদিকে আবেগ তাড়িত হয়ে মানুষ অনেক সময় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করে থাকে। সুতরাং আবেগ হবে কাঙ্খিত পর্যায়ের। অতিরিক্ত সবকিছুই পরিহার্য। এতে করে সামাজিক অবস্থায় বৈচিত্র্যময় মানুষের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তা কেবলমাত্র সম্ভব আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। যেমন:

- চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলে রয়েছে আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।
- আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের মাধ্যমে ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
- নিয়ন্ত্রণের কৌশল অনুশীলন করে।
- সামাজিকীকরণ অপ্রত্যাশিত আবেগ দমনে সহায়ক।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

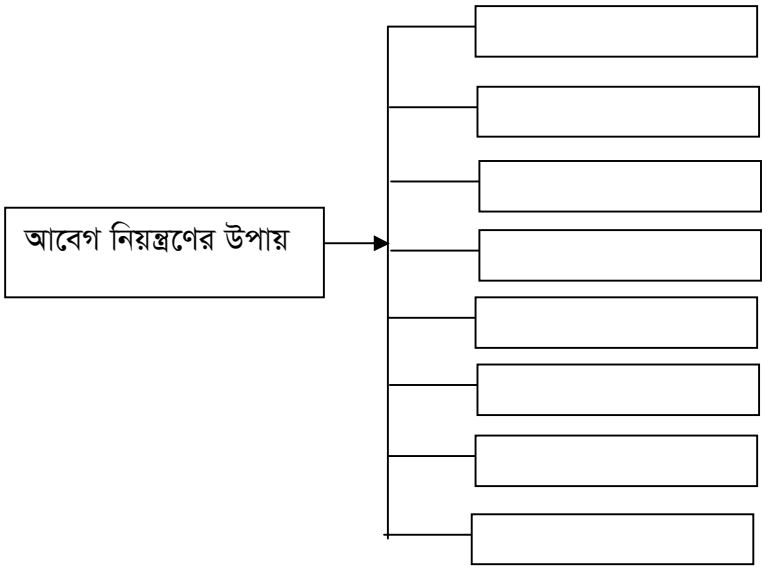

পর্ব-গ : শিক্ষা ও আবেগের সম্পর্ক

আবেগ মানব জীবনে এক প্রয়োজনীয় দিক। কারণ আবেগ কাজের উত্তরণে শক্তি জোগায়। মানব আচরণের ধরণ ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ অজানাকে জানার কৌতূহল ও বিস্ময় মানব সভ্যতাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। নিত্যনতুন কৌতূহল ও বিস্ময় নতুন তথ্য ও জ্ঞান আহরণে কর্মচঞ্চল করে তোলে। অতএব শিখনে কৌতূহল সৃষ্টিতে এবং শিখন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্তকরণে আবেগ সহায়ক ভূমিকা রাখে। শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে আবেগের সুষম বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। শিক্ষার্থীদের আবেগসমূহ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের প্রতি বিদ্যালয় ও সমাজের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবককে তীক্ষ্মদৃষ্টি রাখতে হবে। সত্য, সুন্দর ও মহৎ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ, অসত্য, অন্যায় ও অসামাজিক কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। কারণ জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন শিক্ষার সাথে আবেগের সম্পর্কগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগ

মানব/ব্যক্তি জীবনে আবেগের ভূমিকা

মানব জীবনে আবেগের প্রভাব অসামান্য। যদিও মনে করা হয় মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানব জীবনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান। পৃথিবীর বড় বড় ঘটনা - দূর্ঘটনা যেমন ট্রয়ের যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, বাবরী মাসজিদ ধ্বংস, পাকিস্তান-ভারতের পারমানবিক বিস্ফোরণ, মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ ইত্যাদি অনাকাঙ্খিত ঘটনার পিছনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান ছিল। মনোবিদ রস বলেন "দুটো বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত প্রক্ষোভ মানুষের জীবনে কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে।" আবেগ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, এবং যেকোন আবেগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সী ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা তীব্র আবেগের ব্যক্তি তার বিচার বিবেচনা, বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে না। নিজের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আবেগের ফলে মানসিক অস্থিরতা থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

আবেগ মানুষকে কর্মচঞ্চল করে তুলে, সৃষ্টিধর্মী সমস্ত কাজের পিছনেও আবেগ, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সম্পর্ক স্থাপন, ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি, পরোপকার করা, একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি যাবতীয় কল্যাণকামী ক্রিয়াকর্ম ও আচরণের ক্ষেত্রেও আবেগের ভূমিকা বিদ্যমান।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ

মানব জীবনে আবেগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবেগ ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করায়। আবেগিক সমতা ব্যক্তির গঠনমূলক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে, ব্যক্তির জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি বজায় রাখে। আবেগের অভিব্যক্তি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কেউ সামান্য কারণে রেগে যায়, কেউ রাগ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকের উপস্থিতিতেও নির্বিকার, শান্ত ও

স্বাভাবিক থাকে। কেউ সামান্য কারণে ভীত ও উত্তেজিত হয়। আবেগের যথাযথ সুষ্ঠ বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে তথা জাতীয় জীবনে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে।

সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেগিক নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। সামান্য কারণে কেউ রেগে ওঠে, কেউ সাধারণ সমস্যায় দিশেহারা হয়, কেউ সামান্য অসুখ বিসুখে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে ওঠে। এদের আবেগিক অস্থিরতা গৃহের ও পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে । আবার এমন অনেকে আছেন যারা ধীরস্থির অচঞ্চল, নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। নিম্নে আবেগ নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় তুলে ধরা হলো ঃ

১. পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক এবং মহাপুরুষদের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলে রয়েছে আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। আসলে আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে আবেগিক নিয়ন্ত্রণকেই বোঝায়। আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২. প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনীষীর অভিমত হলো পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের মাধ্যমেই সামাজিক জীবনে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. শিক্ষামনীষীদের মতে শিশুদের মাঝে সহমর্মিতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে অতিরঞ্জিত আবেগ দমন করা যায়।

৪. শিক্ষার্থীর তীব্র আবেগকে উপেক্ষা না করে তার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে নিয়ন্ত্রিত আবেগের সুফল বুঝিয়ে দিয়ে সঠিকভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল অনুশীলন করাতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কচিমনের শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আবেগ দমন করা যায়।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মনোবিদ, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদরা জীবনের বিকাশ ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে আবেগিক নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জীবনের সাথে আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীর তীব্র আবেগকে উপেক্ষা না করে আবেগ প্রশমিত হওয়ার পর শিক্ষক আবেগের ক্ষতিকর দিকগুলি ধীরস্থির ভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন এবং নিয়ন্ত্রিত আবেগের সুফলগুলিও আলোচনা করবেন। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে যেমন: সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত চর্চা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, অভিনয়, নাট্যাভিনয়, অঙ্কন, খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে। সামাজিকতা, সমাজে মেলামেশা ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ও আবেগমূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে।

■ শিক্ষা ও আবেগ

আবেগ মানব জীবনে এক প্রয়োজনীয় দিক। আবেগ কাজের পেছনে শক্তি জোগায়। মানব আচরণের ধরন ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষায় অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, তার ব্যক্তিত্ব সব কিছু নির্ভর করে তার আবেগিক বিকাশের উপর। সুষম আবেগিক বিকাশ সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে।

আনন্দ, কৌতূহল, বিস্ময় যে কোন ব্যক্তিকে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে থাকে। অজানাকে জানার কৌতূহল ও বিস্ময় মানব সভ্যতাকে এই স্তরে উন্নীত করেছে। সমুদ্র তলদেশের বৈচিত্র নিরীক্ষণ, মহাশূন্যে তারকা লোকের রহস্য উদ্ঘাটন, পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ, শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিচরণ করেও মানুষের কৌতূহলের অবসান ঘটেনি। নিত্য নতুন কৌতূহল ও বিস্ময় তাকে নতুন তথ্য ও জ্ঞান আহরণে কর্মচঞ্চল করে তোলে।

শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টিতে শিখন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করবে। শিক্ষককে এ দিকে নজর রাখতে হবে। আবার অন্যান্য আবেগ ও তার সুষম বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের আবেগ সমূহ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের প্রতি শিক্ষক ও অভিভাবককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সত্য, সুন্দর ও মহৎ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ, অসত্য, অন্যায় ও অসামাজিক কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে।

A.T.Jersild এর মতে শিক্ষার্থীদের আবেগমূলক জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষকের কর্তব্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ক্ষমতা অক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত করা এবং পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিবিধান করে চলতে সাহায্য করা। রাগ, ভয়, শোক, দুঃখে শিশু যখন আচ্ছন্ন থাকে তখন সে কোন কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারে না। শিখবার মত মানসিক অবস্থা তার থাকে না তাই জোর করে কোন কিছু শেখালেও শেখাটা স্থায়ী হয় না।

সাধারণত শিক্ষার্থীরা গণিত ও ইংরেজি এ দু'টি বিষয়ে ভয় পায়, পরীক্ষাকে এবং নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে ভয় পায়। এই ভয় শিক্ষার্থীর কর্মশক্তিকে হ্রাস করে এবং আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরায়। ৪-৫ বছর বয়সে শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করে। এই বয়সে মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে নিরাপত্তার অভাববোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ফলে তারা তাদের সহপাঠিদের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারে না এবং পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে না।

এই অহেতুক ভয় দূর করার জন্য শিক্ষককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ বিষয়ের দূর্বলতা দূর করার জন্য তাদের ভূল- ত্রুটিকে দেখিয়ে দিতে হবে এবং ভূল সংশোধনের জন্য বার বার অনুশীলন করাতে হবে। বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব সম্পাদনে তাদের সহায়তা করতে হবে। সমাপ্ত কাজের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করতে হবে। বার বার পরীক্ষা নিয়ে তাদের পরীক্ষা ভীতি দূর করতে হবে।

আত্মবিশ্বাসের অভাব, প্রতিকুল পরিবেশ, স্নেহ - ভালবাসার অভাব, নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি শিশু-কিশোরদের মনে ভয় সৃষ্টি করতে থাকে। বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রয়োজনে সহযোগিতা করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে ভয়, রাগ, সুখ, দুঃখ বিভিন্ন আবেগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজের ভয়,

মানসম্মানের ভয়, মৃত্যু ভয়, আল্লাহর ভয় প্রভৃতি ব্যক্তিকে অন্যায় ও অসামাজিক কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করে।

ভয়, রাগ, ঘৃণা, উদ্বেগ, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা প্রভৃতি আবেগের যথাযথ প্রকাশকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এগুলির অসংযত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিরষ্কার, উপহাস বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেগকে দূর করা যায় না একথা পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক -শিক্ষিকাকে স্মরণ রাখতে হবে।

পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক -শিক্ষিকাকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ও দৃষ্টি রাখতে হবে ঃ

১। আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রকাশের মাধ্যমেই শিশুর জীবন ও তার স্বভাব চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তাই পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁদের সুষ্ঠু ও যথাযথ আবেগিক বিকাশ ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

২। সত্য, সুন্দর ও মহৎ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ সৃষ্টি এবং অসত্য, অন্যায় ও অসামাজিক কাজের প্রতি ঘৃণা বোধ, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে।

৩। যে কোন সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ ও সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

৪। নিজের ক্ষমতা অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং অপরকে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দিতে হবে।

৫। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রেক্ষিতে আকাঙ্খার স্তর নির্ণয় করতে হবে।

৬। প্রত্যেক মানুষের সীমাবদ্ধতা রযেছে, এই সত্যকে স্বীকার করে সফলতা, বিফলতা বা জয়-পরাজয়কে সহজভাবে, গ্রহণ করতে হবে।

৭। ভুল-ত্রুটিকে কেউ দেখিয়ে দিলে সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

৮। ব্যর্থতা, হতাশা, নৈরাজ্য প্রভৃতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে। আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হয়।

৯। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধান করে চলার জন্য সাহায্য করতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে।

১০। আনন্দ, কৌতূহল, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের ও সন্তান-সন্ততিদের সহযোগিতা করতে হবে।

১১। শিক্ষার্থীদের হানিকর ও ক্ষতিকর আবেগগুলো সংযতভাবে প্রকাশের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১২। ব্যক্তি জীবন বিকাশের জন্য উপকারী আবেগগুলোর চর্চার দিকে নজর দিতে হবে।

১৩। সামাজিক সুশৃঙ্খল রীতিনীতিকে সঠিকভাবে মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

১৪। অহেতুক ভয় হতে নিজকে দূরে রাখার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

১৫। সুস্থ স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষমতা অর্জন করতে শিক্ষা দিতে হবে।

১৬। শিক্ষার্থীদের নিজের ভূল নিজে সংশোধন করার যথার্থ যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা যাতে করে শিক্ষার্থী ব্যক্তি জীবনে অসংযত রাগ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ হতে দূরে থাকতে পারে।

১৭। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্খিত আবেগ দমন করে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে।

আনন্দ, কৌতূল, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ যে কোন ব্যক্তিকে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে থাকে। অজানাকে জানার কৌতূহল ও বিস্ময়ই মানব সভ্যতাকে এই স্তরে উন্নিত করেছে। সমুদ্র তলের বৈচিত্র নিরীক্ষণ, মহাশুন্যে তারকালোকের রহস্য উদ্ঘাটন, পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ, শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিচরণ করেও মানুষের কৌতূহলের অবসান ঘটেনি। নিত্য নতুন কৌতূহল ও বিস্ময় তাকে নতুন নতুন তথ্য ও জ্ঞান অন্বেষণে কর্মচঞ্চল করে তোলে। পিতামাতা ও শিক্ষক, ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও কৌতূহল সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন। শিশু-কিশোরের আবেগ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।

মূল্যায়নঃ

১. কৌতূহল কীভাবে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করে?

২. শিখনের ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করুন।

৩. শিক্ষণ-শিখনে আবেগের ভূমিকার যথার্থতা কতটুকু তা ব্যক্ত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

পর্ব-খ, কাজ-১

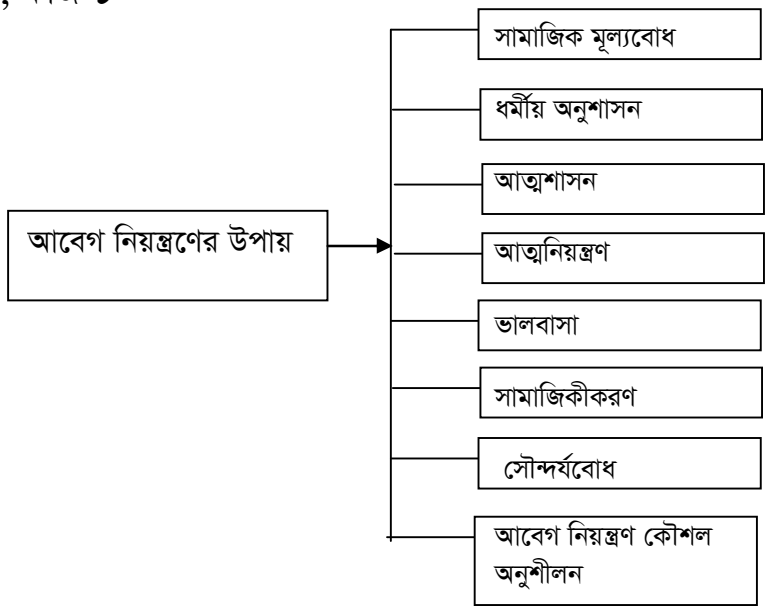

ইউনিট-২ অধিবেশন-৪

স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ও বয়:সন্ধিকাল

ভূমিকা

জন্মগ্রহণের পর শিশু তার নিজস্ব অন্ত:নিহিত বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়। শিশুর সে সকল বৈশিষ্ট্যাবলি আমরা লক্ষ্য করি এবং ক্রমাগত বয়স বৃদ্ধির সাথে সেসব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের অর্জন এবং অবতারণা ঘটায় স্বাভাবিকভাবে। ফলে বয়স ভেদে যেসব বৈশিষ্ট্যাবলি স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয় তাকে স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কোন শিখনের ফল নয়। অর্থাৎ শিশুর জন্মের পর এটি তার সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এক্ষেত্রে এসকল বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও আচরণগত উন্নয়নে সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। শিক্ষার্থীদের বয়স স্তর অনুযায়ী তাকে পরিচালনা করা, নির্দেশনা প্রদান, শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করাই - শিক্ষকের কর্তব্য। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাথীদের বয়:সন্ধিকালে অসংখ্য স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশকরণে সঠিক দিক নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বয়:সন্ধিকালের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বয়:সন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক এবং আবেগিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বয়:সন্ধিকালের চাহিদা নিরূপণ করতে পারবেন।
- বয়:সন্ধিকালে সৃষ্টি সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : বয়:সন্ধিকাল ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয় অবতারণা

শৈশব ও বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর যে দ্রুত, বাড়ন্ত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল সময় তাকে বয়:সন্ধিকাল বলা হয়। ইংরেজিতে Adolescence এর অর্থ

পরিপক্কতা অর্জন। সাধারণত ১২ থেকে ১৯ বৎসর পর্যন্ত সময়কে বয়:সন্ধিকাল ধরা হয়। অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রভাবে এটা কিছুটা পরিবর্তনশীল। ১২ থেকে ১৪ বৎসরকে প্রারম্ভিক বয়:সন্ধিকাল (Early Adolescence) এবং ১৫-১৯/২১ বৎসরকে প্রান্তিক বয়:সন্ধিকাল (Late Adolescence) হিসেবে ধরা হয়। অনেকে যৌন পরিণতির স্তরকে বয়:সন্ধিকাল বা কৈশোরকাল বলে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাল্যকালের শেষ পর্যায় ও কৈশোরের আগমনের সন্ধিক্ষণকে বয়:সন্ধিকাল (Puberty) বলে।

এ সময়কালে মানব জীবনের মনের রাজ্যে বার বার নতুন চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পাশাপাশি মানসিক আবেগিক বিকাশ ঘটতে থাকে। ব্যক্তিক, সামাজিক বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ফলে জগতের সকল কিছুকেই নতুনরূপে অনুধাবন এবং বাস্তবতা অনুসন্ধানে অতি আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় ও তা পেতে অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করে। সামাজিকভাবে স্বীয় অবস্থানের তুলনাকরণ এবং ভারসাম্যতা বজায়ে নানান অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিজেদের সময় কাটাতে হয়। ফলশ্রুতিতে এদের অনেকেই সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে বিপথগামী হয়ে পড়ে। যা তার ভবিষ্যত পরিকল্পনায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা মানব জীবনের বয়:সন্ধিকালের অবতারণাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

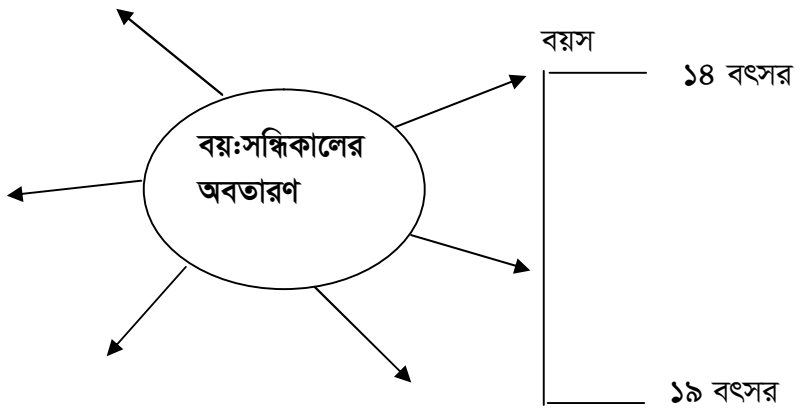

পর্ব-খ : বয়:সন্ধিকালে শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা

শিশু জন্মের পর জন্মগত সূত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমাগত প্রকাশ পেতে থাকে। এসকল বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিক, সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে দ্রুত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে থাকে। হতে থাকে নৈতিক উন্নয়ন। এক্ষেত্রে মানব জীবনের শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক, সামাজিক চাহিদার উপর আবেগিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার আচরণের বহি:প্রকাশে প্রকাশ পায়। প্রাথমিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ধনের পাশাপাশি উচ্চতা ও শারীরিকভাবে পূর্ণতায় পৌঁছায়। ছেলেমেয়েদের পেশীর শক্তি, দৃঢ়তা, সতেজতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেহের অবকাঠামোর পরিবর্ধন ঘটে। যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি, বিকাশ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। শরীরের অভ্যন্ড়রীণ অন্ত্রসমূহ ও অন্ত:ক্ষরাগ্রন্থির (Ductless gland) বিকাশ ঘটে। মানসিকভাবে প্রথমে বুদ্ধির পরিণমনতা আসতে থাকে। প্রান্তীয় বয়:সন্ধিকালে বুদ্ধির পরিপূর্ণতা আসে। সঠিক বুদ্ধি সম্পন্ন কাজ করতে পারে। বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

এ বয়সের ছেলেমেয়েরা তীব্রভাবে আবেগ অনুভূতির প্রবণতা প্রকাশ করে। বন্ধুত্ব গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষোভের মাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট থাকে। প্রতিযোগিতার মনোভাব দৃঢ় হয়। এ ধরনের বহুমুখী পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানের নিমিত্তে নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। যেমন: আত্মপ্রকাশের চাহিদা, যৌন কৌতূহলের চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, জ্ঞানের চাহিদা, সৃষ্টিমূলক চাহিদা, জীবনাদর্শনের চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন বা প্রাপ্তির চাহিদা।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা বয়:সন্ধিকালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

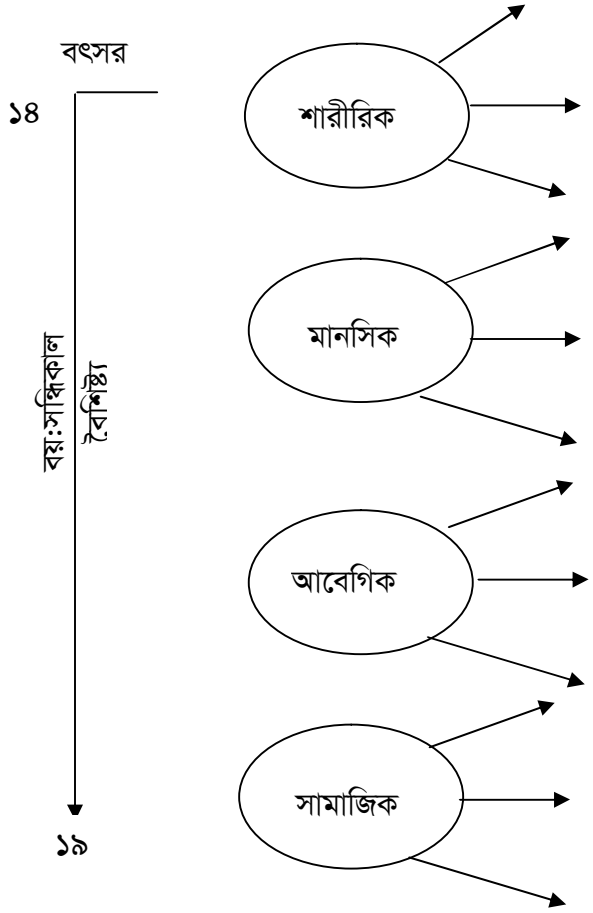

পর্ব-গ : বয়:সন্ধিকালের সমস্যা

বয়:সন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিক উন্নয়নের সমন্বিত করলে যথাযথ দিক নির্দেশনার অভাবে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল সমস্যা বিভিন্ন সময়ে এত জটিলাকার ধারণ করে যে শিক্ষার্থীর সার্বিক জীবন বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন: দৈহিক পরিবর্তনজনিত সমস্যা, আবেগিক সমস্যা, হরমোনের কার্যকারিতাজনিত সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, আন্ত:কেন্দ্রিকতার সমস্যা, স্ব-প্রকাশে সমস্যা, নীতিবোধের সমস্যা, চাহিদাজনিত সমস্যা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, জীবনদর্শনজনিত সমস্যা, বৃত্তি নির্বাচনের সমস্যা ইত্যাদি।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা বয়:সন্ধিকালে সৃষ্ট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

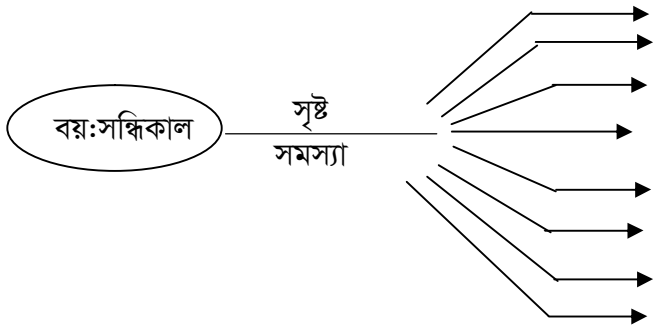

কাজ-২

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার বয়:সন্ধিকালে সৃষ্ট যে সমস্যাগুলো আপনি চিহ্নিত করলেন তা কীভাবে সমাধান করা যায় বলে আপনি মনে করেন নিচের বক্সে উল্লেখ করুন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় দেখে নিন।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ও বয়ঃসন্ধিকাল

● স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য

জন্মগ্রহণের পর শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলি যা আমরা লক্ষ্য করি ক্রমাগত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সে সব পরিবর্তন ও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে থাকে। ফলে বয়স ভেদে যে সব বৈশিষ্ট্যাবলি স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয় তাকে স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কোন শিখনের ফল নয়। যেমন: জন্মের সময় শিশুর দাঁত থাকেনা, কিন্তু ১ বৎসর বয়সে চার থেকে ছয়টি দাঁত উঠে। শৈশব ও বাল্যকালে ছেলেদের দাঁড়ি থাকেনা কিন্তু কৈশোরকালে দাঁড়ি গোফ উঠে। শৈশব ও বাল্যকালে মেয়েদের বুক সমান থাকে, কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালে স্তন বড় হয় ইত্যাদি যেমন শারীরিক বৈশিষ্ট্য তেমনি বয়স স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীদের বয়সস্তর অনুযায়ী যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় সে সব জানা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করা, তাকে পরিচালনা করা, নির্দেশনা প্রদান, পাঠ দান পদ্ধতি অবলম্বন এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করাই শিক্ষকের কর্তব্য। বয়ঃসন্ধিকালের (মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসংখ্য স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

● বয়ঃসন্ধিকাল

শৈশব ও বাল্যকাল পেরিয়ে সংক্ষিপ্ত বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর যে দ্রুত, বাড়ন্ত, পরিবর্তনশীল সময় তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। ইংরেজি Adolescence এর অর্থ হল পরিপক্কতা অর্জন (To grow maturity)। সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৯ বৎসর পর্যন্ত সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল ধরা হয়। আবহাওয়া ও অঞ্চলভেদে এটা কিছুটা পরিবর্তনশীল। ১২ - ১৪ বৎসরকে প্রারম্ভিক বয়ঃসন্ধিকাল (Early Adolescence) এবং ১৫-১৯/২১ বৎসর প্রান্তিক বয়ঃসন্ধিকাল (Late Adolescence) বলা হয়। অনেকে যৌন পরিণতির (Puberty) স্তরকেই বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল বলে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাল্যকালের শেষ পর্যায় ও কৈশোরের আগমনের সন্ধিক্ষণকে বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) বলে।

"বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীরা হলো ফ্লেপার (Flepper) অর্থাৎ যে পাখির এখনও পরিপূর্ণ পাখনা গজায়নি অথচ বাসাতেই উড়বার অব্যাহত চেষ্টা করছে" - Stanly Hall.

- বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের একটি বিশেষ সময়কাল যেখানে উপনীত হলে মনের রাজ্যে বার বার নতুন চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয়। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে তাদের মানসিক, আবেগিক বিকাশ ঘটতে থাকে এবং সামাজিক বোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, ফলে জগতকে তারা নতুনরূপে দেখতে ও উপলব্ধি করতে থাকে। বিশেষ করে যৌবনাগমনের ফলে জীবনের উপলব্ধিটাও সম্পূর্ণ নতুনভাবে রূপ নেয়। তাদের মধ্যে অনেক নতুন চাহিদাও সৃষ্টি হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে স্বীয় অবস্থানের সংগতি বিধান, চাহিদার পূরণ ও সমস্যাবলি সমাধানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষায় অসুবিধার মধ্য দিয়ে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের কাটাতে হয়।

- **বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি**

(১) প্রাথমিক বয়ঃসন্ধিকালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ধন সম্পন্ন হয় এবং প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ভাবে পূর্ণতায় পৌঁছায়।

(২) ছেলেমেয়েদের পেশীর শক্তি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা এবং সতেজতা বৃদ্ধি পায়। দেহের সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্ধন হয়ে থাকে।

(৩) যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি, বিকাশ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়; প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে পূর্ণতায় পৌঁছায়। ছেলেদের পিতৃত্ব এবং মেয়েদের মাতৃত্ব প্রবণতার সকল আঙ্গিক বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং ক্ষমতা লাভ করে।

(৪) শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমন্ডলি ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (Ductless Gland) বিকাশ ঘটে।

- **বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলি**

(১) প্রাথমিক বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের মাঝে বুদ্ধির পরিণমনতা আসতে থাকে এবং প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধির পরিপূর্ণতা আসে। এ সময় তারা সঠিক বুদ্ধি সম্পন্ন কাজ করতে পারে।

(২) চিন্তা শক্তির দৃঢ়তা আসে এবং বিমূর্ত চিন্তার বিকাশ ঘটে।

(৩) এ বয়সে যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা আসে বিধায় তারা যুক্তি প্রদানে সক্ষম হয় ও যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হয়। যুক্তি সহকারে সবকিছুকে বুঝতে চায়।

(৪) বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে ফলে অনুসন্ধান করে তার সম্পর্কে সে বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়।

- **বয়ঃসন্ধিকালের আবেগিক বৈশিষ্ট্যাবলি**

(১) এ বয়সের ছেলেমেয়েরা তীব্রভাবে আনন্দ অনুভূতির আবেগ প্রকাশ করে।

(২) আবার তারা সামান্যতে বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়। সামান্যতে অভিমান করে; ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি অভিমানী হয়।

(৩) যে কোন আক্রমণাত্বক অনুভূতির কারণে লজ্জা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

(৪) প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীর মাঝে ভয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্মুখীতার আবেগ থাকে।

(৫) এদের আবেগের মধ্যে অহমিকার ও ঈর্ষাবোধ বেশি থাকে। নিজের বুঝের উপর প্রাধান্য দিতে চায়।

(৬) তাদের আবেগ সংঘাতময় হয়ে থাকে; নৈতিক সেন্টিমেন্ট বেশি থাকে।

(৭) এ বয়সে আবেগের মধ্যে সমবেদনার চাইতে মর্মবেদনা বেশি থাকে।

- **সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি**

(১) প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের মাঝে দলগঠনের প্রবণতা বেশি থাকে।

(২) তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সহানুভূতি ও সহযোগিতার অনুভূতি প্রবল হয়।

(৩) তখন ছেলেমেয়ে উভয়ে উভয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয় এবং লেখালেখিতে নেমে পড়ে।

(৪) এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মাঝে মানবতাবোধ এবং জনকল্যাণমূলক কাজের প্রবণতা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

(৫) তখন ছেলেমেয়েদের মাঝে মানুষের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হয় এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়।

- **বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের চাহিদা**

বয়ঃসন্ধিকালে বহুমুখী পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের সঙ্গে নতুনভাবে সংগতি বিধানের নিমিত্তে নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানী Stanly Holling Worth বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণকৃত চাহিদাগুলি হল :

(১)আত্মপ্রকাশের চাহিদাঃ যৌবনাগমকালে শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মপ্রকাশের চাহিদা তীব্রভাবে দেখা দেয়। তারা খেলাধূলা, নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে বড়দের সামনে নিজেকে জাহির করতে চায়। তারা কঠিন কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

(২) স্বাধীনতার চাহিদা ঃ তারা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। ছেলেমেয়েদের তখনকার এ স্বাধীন আকাঙ্খা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির ফল।

(৩) যৌন চাহিদা ঃ যৌনতার বিকাশের ফলে তাদের মধ্যে যৌন চাহিদা দেখা দেয়। তাদের মাঝে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে কাছে পেতে চায়।

(৪) সামাজিক চাহিদা ঃ এ স্তরে মানসিক ও আবেগিক বিকাশের ফলে গৃহ, পরিবার, সমাজ তথা পৃথিবী সম্পর্কে নানা ধরনের অনুভূতি এবং কৌতূহল জাগ্রত হয়। এটা তাদের সামাজিক চাহিদা। খেলার সাথী, সহপাঠির সঙ্গে দল গঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তারা এ চাহিদা পূরণ করে।

(৫) জ্ঞানের চাহিদা ঃ চিন্তন, বুদ্ধি, যুক্তি প্রদান ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বহুবিধ প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। এটাই তাদের জ্ঞানের চাহিদা। এ চাহিদা সঠিকভাবে পূরণের উপর তাদের দক্ষতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি নির্ভর করে।

(৬) দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা ঃ তাদের জ্ঞানের চাহিদা ও কৌতূহলের বশবর্তীতে এবং অদম্য পেশী শক্তির বলে দুঃসাহসিক কাজ করে নিজেকে জাহির করতে চায় এমন কি ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও নেমে পড়ে। কৌতূহল ও আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করার জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

(৭) জীবনাদর্শের চাহিদা ঃ এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবনাদর্শের চাহিদা সৃষ্টি হয়। জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাদের মাঝে দানা বেঁধে উঠে। আত্মসত্তার বিকাশের সঙ্গে তারা জীবন দর্শন নিয়ে ভাবতে থাকে এবং সুন্দর জীবন বিকাশের দর্শন খুঁজতে থাকে।

(৮) নীতি বোধের চাহিদা ঃ তাদের মাঝে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। অপকর্মের জন্য দুঃখ অনুভব করে, স্বীয়কর্মের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চায়।

(৯) নিরাপত্তার চাহিদাঃ এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সামাজিক শাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন, বয়স্কদের অনুশাসন ইত্যাদি থেকে তারা নিরাপত্তা খোঁজে। তারা নিজেদের অবস্থান, দায়িত্ব কর্তব্য ও কর্মভয়ের আশংকা দূর করতে চায়।

(১০) পেশা বা বৃত্তির চাহিদা ঃ এ বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম হয় বিধায় ভবিষ্যত পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন ও স্বাধীনভাবে উপার্জনক্ষম হয়ে সমাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করার জন্য পেশা বা বৃত্তির চাহিদা তীব্রভাবে অনুভব করে।

- **বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাবলি**

(১) দৈহিক পরিবর্তনজনিত সমস্যা।
(২) পেশীয় দক্ষতা জনিত সমস্যা।
(৩) হরমোনে কার্যকারিতা জনিত সমস্যা।
(৪) আবেগিক সমস্যা।
(৫) যৌন চাহিদা জনিত সমস্যা।
(৬) বীরত্ববোধের সমস্যা।
(৭) অপরাধ প্রবণতা।

(৮) নীতিবোধের সমস্যা।
(৯) স্বাধীনতার চাহিদা জনিত সমস্যা।
(১০) আত্ম প্রকাশের চাহিদাজনিত সমস্যা।
(১১) সামাজিক চাহিদাজনিত সমস্যা।
(১২) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা।
(১৩) নতুন জ্ঞানের চাহিদা জনিত সমস্যা।
(১৪) বৃত্তিহীনতার সমস্যা।
(১৫) জীবনাদর্শজনিত সমস্যা।

• সমস্যা সমাধানের উপায়

(১) তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
(২) উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।
(৩) সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে।
(৪) কাজ বন্টন ও দায়িত্ব প্রদান ক'রে।
(৫) ভাল কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিয়ে।
(৬) তাদের চাহিদার পরিতৃপ্তি দিয়ে।
(৭) সুস্থ যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে।
(৮) নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে।
(৯) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে।
(১০) সুন্দর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

মূল্যায়নঃ

১. বয়:সন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকের কোন ভূমিকা আছে কি? থাকলে সেটা কেমন হবে - আলোচনা করুন।

২. বয়:সন্ধিকালে কোন ধরনের পরিবেশ আবেগীয় সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে বলে আপনি মনে করেন?

৩. আপনার বয়:সন্ধিকালে আপনি কোন আবেগীয় সমস্যায় পড়েছিলেন কি? সমস্যা সমাধানের জন্য সে সময় মা, বাবা, বন্ধু-বান্ধব অথবা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কোন ধরনের সহযোগিতা আপনার প্রয়োজন ছিল?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৫**

এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের ৮ স্তর

ভূমিকা

পরিণমন ও অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ধারাকে বিকাশ বলে। এটি গুণগত পরিবর্তন যা জীবনব্যাপী সংঘটিত হয়। গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। জীবনের বিভিন্ন স্তর বা বয়সে বিভিন্ন ধরনের বিকাশ/পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক স্তরে বা বয়সে আলাদা আলাদা চাহিদা, আবেগ, অনুভূতি, প্রকাশ ভঙ্গি, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা, দায়িত্ব-কর্তব্য পরিলক্ষিত হয়। সে প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ মানব জীবনকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং স্তর অনুযায়ী ক্রিয়া-কর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা বর্তমান অধিবেশনে একজন বিখ্যাত জার্মান মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসন এর মনঃসামজিক বিকাশের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের স্তরগুলো লিখতে পারেবেন।
- জীবনের কোন স্তরে কোন ধরনের সংঘাতের ভিতর অতিবাহিত হয় তা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীবন পরিক্রমার সফলতা বিফলতার প্রেক্ষাপট (বিষয় ভিত্তিক) ও তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্ব-কঃ এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের সাধারণ ধারণা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসুন এবং চোখ বন্ধ করে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবুন।

বন্ধুরা, নিশ্চয়ই আপনাদের ভাবনায় শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রাপ্ত বয়স্ক, বার্ধক্য ইত্যাদি স্তরে মানুষের চাহিদা, আবেগ, অনুভূতি, প্রকাশ ভঙ্গি, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

হ্যাঁ বন্ধুরা, স্তর অনুযায়ী মানব জীবনের বিকাশ সাধিত হয়। এরিকসন (১৯৬৮) মনে করেন, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের সময় কিছু সংকটের মাধ্যমে তার আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। বিকাশের এই সংকটগুলো হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় নয়তো বিকাশের গতিকে ব্যাহত করে। আমাদের ব্যক্তিত্ব কতটা সংহতিপূর্ণ হবে তা এই সংকট দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এরিকসন ধারণা পোষণ করেন যে, ব্যক্তি যখন বেড়ে ওঠে তখন সে সমাজের বিভিন্ন লোকজনের সাথে ভাবের আদান প্রদান করে। এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তি তার পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় এবং চারদিকের জগতকে ও নিজেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এরিকসনের মতে, ব্যক্তি যখন গ্রহণযোগ্য উপায়ে তার সংকটগুলো বা মনঃসামাজিক সমস্যাগুলো নিরসন করতে পারে তখনই তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে।

এরিকসন মনঃসামাজিক বিকাশের ৮টি সুনির্দিষ্ট স্তরের কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তিত্বের উপর কিছু চাহিদা ন্যস্ত হয়। এতে সংকট ও দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। পরের স্তর আরম্ভ হওয়ার আগেই এই সংকটের অবসান হলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়। শিশু এই স্তরগুলো অতিক্রম করে আস্তে আস্তে পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে যায়।

পর্ব-খঃ এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশে স্ড়রসমূহ

প্রিয় শিক্ষার্থী, পূর্ববর্তী পর্ব থেকে আমরা এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করেছি। এবার আমরা এ তত্ত্বের স্তরগুলোর সাথে পরিচিত হব। এরিকসন আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মনঃসামাজিক বিকাশকে ৮ টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। স্তরগুলো হলো: মৌখিক অনুভূতি স্তর, পেশীজ ও পায়ু স্তর , স্বয়ংক্রিয়াশীল স্তর , সুপ্ত প্রতিভা স্তর , দ্রুত বিকাশ স্তর , যৌবন কাল, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং পরিপক্ক স্তর ।

কাজ-১

এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের প্রত্যেক স্তরের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কাজগুলো উল্লেখ করুন।

ক্রমিক নং	মনঃসামাজিক স্তর	ইতিবাচক কাজ	নেতিবাচক কাজ
১	মৌখিক অনুভূতি স্তর		
২	পেশীজ ও পায়ু স্তর		
৩	স্বয়ংক্রিয়াশীল স্তর		
৪	সুপ্ত প্রতিভা স্তর		
৫	দ্রুত বিকাশ স্তর		
৬	যৌবন কাল		
৭	প্রাপ্ত বয়স্ক		
৮	পরিপক্ক স্তর		

কাজ-২

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের প্রত্যেক স্তরের সময় কাল, গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং দ্বন্দ্ব উল্লেখ করুন।

ক্রমিক নং	মনঃসামাজিক স্তর	সময় কাল	গুরুত্বপূর্ণ কাজ	দ্বন্দ্ব
১	মৌখিক অনুভূতি স্তর			
২	পেশীজ ও পায়ু স্তর			
৩	স্বয়ংক্রিয়াশীল স্তর			
৪	সুপ্ত প্রতিভা স্তর			
৫	দ্রুত বিকাশ স্তর			
৬	যৌবন কাল			
৭	প্রাপ্ত বয়স্ক			
৮	পরিপক্ক স্তর			

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের ৮ স্তর

জার্মান মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসন মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের ছাত্র ছিলেন। তিনি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এরিকসন ব্যক্তির বিকাশে ফ্রয়েডের মতো মানসিক সংগঠনের নীতি, যৌনশক্তি বিকাশ নীতি এবং অবচেতন মনের প্রেষণার নীতির উপর আস্থা রেখে স্বীয় তত্ত্বের অবতারণা করেন। তিনি মূল মনঃসমীক্ষণ পদকে বিস্তৃত করে মানুষের জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বকে বড় করে দেখেছেন। তাই তার তত্ত্বকে মনঃসামাজিক (Psycho-Social Theory) বলা হয়। ফ্রয়েড বলেছেন, মানুষের অবচেতন মনে অবস্থিত অদস (Ed) সকল আচরণের উৎস এবং তা হতে অহম (Ego) এর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরিকসন বলেন, মানুষের অহম (Ego) জন্মাবস্থায় বজায় থাকে। এটাই তার তত্ত্বের মূল ভিত্তি। এ ধারণার তাৎপর্য হচ্ছে :

১। অহম (Ego) ব্যক্তির মাঝে জন্মাবস্থায় স্বাধীন ভাবে অবস্থান করে এবং এটি একটি স্বাধীন সত্ত্বা।

২। এরিকসনের মতে, অদস (Id) এবং অহম (Ego) এর কোন দ্বন্দ্ব নেই। অহম সম্পূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব মুক্ত। মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু সে দ্বন্দ্বে অদস ও অহম অংশগ্রহণ করে না।

৩। ব্যক্তির দ্বন্দ্ব হলো সমাজের মধ্যে। অর্থাৎ জীবন বিকাশের মূল কারণ মনঃসামাজিক দ্বন্দ্ব (Psycho-social conflict)। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সংকটের সৃষ্টি হয়। তিনি এ সংকটকালগুলোকে জীবন বিকাশের এক একটি স্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তির অহম সত্ত্বার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে কি ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হয় তার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্যক্তির প্রত্যেকটি বিকাশের স্তরের সাধারণ আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখসহ কী কী

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে সেগুলোও বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্নে তার ৮টি স্তর সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

১. মৌখিক অনুভূতি স্তর

বয়সঃ জন্ম থেকে ০১ বৎসর
দ্বন্দ্বঃ বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ খাওয়ান।

বর্ণনাঃ এ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাচ্চাকে খাওয়ান। এরিকসনের মতে একমাত্র যদি পিতামাতা কিংবা ধাত্রী শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি (যেমনঃ দুধ খাওয়ানো, পয়ঃপরিষ্কার ইত্যাদি) যথাযথভাবে পূর্ণ করেন তবে বাচ্চার মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। শিশুকে যত্ন ও আরামদায়কভাবে এবং নিয়মিতভাবে খাওয়ানো এবং যত্ন নেওয়া হয় তাহলে পিতামাতা/ধাত্রীর সঙ্গে শিশুর বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তা না হলে তার মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

বিশ্বাসবোধ সৃষ্টি, আদর-যত্ন ও আরাম আয়েশে তার ইচ্ছাগুলো পূরণ হওয়ার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের যথার্থ ও দায়িত্বশীল সাড়া খুবই জরুরী।

যে সমস্ত শিশু তাদের মায়ের সংস্পর্শ পায়না বা অতি কম পায় তারা তাদের মায়ের প্রতি আক্রমণাত্মক ও কম সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করে। বয়স বৃদ্ধির পর দেখা যায় তারা তাদের সহপাঠিদের সঙ্গে কম সহানুভূতিশীল ও কম দক্ষতা প্রদর্শন করে। পারিপার্শ্বিক জগতেও কম সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

২. পেশীজ ও পায়ু স্তর

বয়সঃ ০১ থেকে ০২ বৎসর
দ্বন্দ্বঃ স্বাধীনতা বনাম সন্দেহ
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ পয়ঃনিষ্কাশন প্রশিক্ষণ

বর্ণনাঃ এরিকসনের মতে এ স্তর শিশুদের কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও

আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তারা নিজে নিজে প্রস্রাব পায়খানা করতে ও নিজ হাতে পোষাক পরতে শেখে। এ স্তরে পিতামাতার উচিত হবে না শিশুকে অতি যত্ন করা অর্থাৎ শিশুকে তার নিজ থেকে কিছু করতে না দেওয়া। শিশু নিজ থেকে যা করবে তার স্বীকৃতি দিতে হবে। তা না হলে শিশু তার স্বীয় সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহবান হয়ে পড়বে। শিশুর আত্মনির্ভরশীলতার দিকে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। এ স্তরে যে সমস্ত শিশু অতি সন্দেহের মধ্যে কাটায় ভবিষ্যতে তারা তাদের কর্ম দক্ষতার প্রতিও সন্দেহ পূর্ণ হয়ে পড়ে।

শিশুর স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ অর্থাৎ তার নিজ হাতে খাওয়া সম্পন্ন করা, পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি এ স্তরের বিকাশের ইতিবাচক দিক।

শিশুর ক্রিয়াকলাপে তার যোগ্যতার অস্বীকৃতি ও স্বাধীনতায় বাঁধা প্রদান তাকে তার জ্ঞান ও দক্ষতায় অর্থাৎ তার মনঃপেশীজ ক্রিয়া কর্মে লাজুকতা সৃষ্টি করে এবং স্বীয় মননশীলতা ও কর্মদক্ষতায় সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ে যার প্রভাব ভবিষ্যৎ জীবনেও পড়ে। অতি যত্নে লাজুকতা সৃষ্টি এবং স্বাধীনভাবে চলায় বাঁধা দান এ স্তরের নেতিবাচক দিক।

৩. স্বয়ংক্রিয়াশীল স্তর

বয়সঃ ০২ থেকে ০৬ বৎসর (বাল্যকাল)
দ্বন্দ্বঃ উদ্যোগ বনাম অপরাধ
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ স্বাধীনতা

বর্ণনাঃ এ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর স্বাধীনতা। এ স্তরে শিশু স্ব-উদ্যোগে কিছু কাজ করতে চায় এবং বীরত্ব প্রদর্শন করে। সে নিজে কোন কিছুর দায়িত্ব নিতে চায়। ক্ষুদ্র হোকনা কেন তার এ দায়িত্ব গ্রহণ ও উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। তার উদ্যোগ ও দায়িত্ব গ্রহণকে স্বীকৃতি না দিলে সে মনে করে যে, সে যাই করে তা ত্রুটিপূর্ণ। ফলে নিজেকে সে অপরাধী মনে করে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হয়। এ স্তরে যে সমস্ত শিশু অতি সন্দেহে নিপতিত হয় পরবর্তী জীবনেও তারা কম আত্মবিশ্বাসী হয়। পিতা মাতার উচিত হবেনা এ স্তরে শিশুকে অতি যত্ন করা।

শিশুকে এ স্তরে তার কৃতকর্মসমূহে অপরাধমুক্ত অবস্থায় চলতে দিতে হবে। তার অপরাধকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। সে বড়দের ভূমিকায় আসতে চায়। তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। এটাই এ স্তরের ইতিবাচক দিক। যেমন: ৪ বছরের শিশু তার পিতাকে সাইকেল সারতে দেখে একটি টুল এগিয়ে দিল। তার একাজকে প্রশংসা করা জরুরী।

শিশুকে নিজ থেকে কিছুই করতে না দেওয়াতে সে মনে করে সে যাই করে তা ত্রুটিপূর্ণ এবং সে অপরাধী। এটাই এ স্তরের নেতিবাচক দিক।

৪. সুপ্ত প্রতিভা স্তর

বয়সঃ ০৬ থেকে ১২ বৎসর (প্রাথমিক শিক্ষাকাল)
দ্বন্দ্বঃ উদ্যম বনাম হীনমন্যতা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ স্কুল

বর্ণনা: এ স্তরে শিশুরা কোন সম্পাদিত কর্ম ও অধ্যবসায়ের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করে এবং কর্ম সম্পাদনের পূর্ণতায় আনন্দ বোধ করে। এ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি। এ স্তরে বালক বালিকারা বিদ্যালয়ে তার কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে। সহপাঠিদের সাথে তার মিথস্ক্রিয়া এ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ স্তরে তারা লেখাপড়া, দলীয় কার্যাবলি এবং বন্ধুদের সঙ্গে বহুবিধ কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। এ স্তরে এ সকল ক্রিয়া কর্মে ও কোন কিছুতে অসুবিধা দেখা দিলে তারা হীনমন্যতায় ভোগে।

কাজ করা ও আনন্দ উপভোগ, সহপাঠিদের সঙ্গে সম্পর্ক ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা এ স্তরে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই এ স্তরের ইতিবাচক দিক।

বাড়ীতে ও সহপাঠিদের জগতে মেলামেশায় অসুবিধা সৃষ্টি এ স্তরে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে। এটাই এ স্তরের নেতিবাচক দিক।

এ স্তরে বালক বালিকারা সৃষ্টিধর্মী কাজ ভালবাসে যেমন: গাছে পানি দেওয়া, বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও এসবের রেকর্ড রক্ষা করায় শিক্ষককে সহায়তা করতে ভালবাসে।

৫. দ্রুত বিকাশ স্তর

বয়সঃ ১২ থেকে ১৮ বৎসর
(বয়ঃসন্ধিকাল)
দ্বন্দ্বঃ আত্মবোধ বনাম দ্বিধা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ সমগোত্রীয় সম্পর্ক

বর্ণনাঃ এ স্তরে বয়ঃসন্ধিকালের বালক বালিকারা আত্মসচেতন হয়ে উঠে। সমাজে নিজের একটি পরিচিতি নিজের একটি স্থান চায়। পিতামাতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে বন্ধু বান্ধবের গন্ডিভুক্ত হতে চায়। বাল্যকালের দ্বিধা দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে চায়। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা কম থাকা সত্ত্বেও বড়দের পাশাপাশি অবস্থান করতে চায় ও তার আত্মকর্মের স্বীকৃতি চায়। বিগত স্তরগুলোর দ্বন্দ্বে যারা সফল হয়ে এসেছে তারা এ স্তরে সফলতা অর্জন করে এবং তারা আত্মবিশ্বাসী হয় ও কর্মে উদ্যোগী হয়ে উঠে। বিগত স্তরসমূহের দ্বন্দ্ব অতিক্রমে যারা পিছিয়ে ছিল এ স্তরে বন্ধুত্ব গড়তেও তারা পিছিয়ে থাকে এবং হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এ স্তরে যদি পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন, যৌন উপলব্ধি, জীবনের স্বাভাবিক গতি ও স্বীয় ভূমিকা অবলম্বনে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে তবে তার ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হয়।

আত্মচেতনা অনুসন্ধানে স্বীয় মর্যাদাবোধে তৃপ্তিলাভ - এ স্তরের ইতিবাচক দিক।

জীবনের স্বাভাবিক গতিতে চলা এবং পেশা নির্বাচন ও যৌন সম্পর্ক সৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগা- এ স্তরের নেতিবাচক দিক।

৬. যৌবন কাল

বয়সঃ ১৯ থেকে ৪০ বৎসর
(পূর্ণ যৌবনকাল)
দ্বন্দ্বঃ ঘনিষ্ঠতা বনাম একাকীত্ব/ বিচ্ছিন্নতা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ প্রীতির সম্পর্ক

বর্ণনাঃ এ স্ড়রে গুরত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রীতির সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা । ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। যারা আত্মোপলব্ধি ও বৈশিষ্ট্যবোধে পিছিয়ে থাকে, ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে তারা দুর্বল। তারা সম্পর্ক স্থাপনে পিছিয়ে থাকে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, যৌন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতাকে বুঝায় না। যৌন সম্পর্ক ব্যতিরেকে ঘনিষ্ঠতা হয়, পারস্পরিক মেলামেশা, আদান প্রদান, ক্রিয়া কর্মের অঙ্গীকারাবদ্ধ ও প্রীতির মাধ্যমে। অঙ্গীকারাবদ্ধ ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত যৌন সম্পর্ক হতে পারে। পারস্পরিক উঠা বসা ও ক্রিয়াকর্মে পারস্পরিক তৃপ্তি, নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতাকে বৃদ্ধি করে।

ব্যক্তির অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অঙ্গীকার ও মুক্ত মনে মেলামেশা এবং আস্থা নিয়ে চলাফেরা ও ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত থাকা- এ স্তরের ইতিবাচক দিক।

ব্যক্তির আত্মবোধ কম থাকা এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভীতি- এ স্তরের নেতিবাচক দিক।

৭. প্রাপ্ত বয়স্ক

বয়সঃ ৪০ থেকে ৬৫ বৎসর
দ্বন্দ্বঃ অগ্রমুখীতা বনাম বদ্ধতা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ পিতৃত্ব/ মাতৃত্ব

বর্ণনাঃ এ স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যত্ন নেওয়া ও গড়ে তোলা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যত্ন করে পরিচালনা করা ও নির্দেশনা দান হচ্ছে অগ্রমুখীতা। সন্তান থাকা ও তাদের প্রয়োজন মেটান ও সমর্থন দান করা ব্যাপক অর্থে অগ্রমুখীতা। এরিকসনের মতে "কোন ব্যক্তি এ স্তরে মৃত্যুর চিন্তাকে পাশে রেখে ভারসাম্যতা বজায় রেখে স্বীয় জগতের শুভ কামনা ও উচ্চ স্তরের চিন্তা নিয়ে চলা এবং ক্রিয়া কর্মের নিশ্চয়তার মধ্যে সুখ ভোগ করাই তার আকাঙ্ক্ষা" (এরিকসন ১৯৭৪ খৃঃ)।

সন্তান লালন পালন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্রিয়াকলাপে সম্পৃক্ত থাকা এ স্তরের ইতিবাচক দিক।

ব্যক্তির পরবর্তী জীবনকে বদ্ধ করে দেয় এমন ব্যাপার নিয়েও কোন ব্যক্তি চলতে পারে -এটা এ স্তরের নেতিবাচক দিক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সমতা, সাম্য প্রতিষ্ঠা, পরিবেশের উন্নয়ন, তাদের জন্য কেমন জগত রেখে যাচ্ছি-এ ধরনের চিন্তা অগ্রমুখীতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮. পরিপক্ক স্তর

বয়সঃ ৬৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (বার্ধক্য)।
দ্বন্দ্বঃ সামঞ্জস্যতা বনাম বৈক্লব্য (নৈরাশ্য)।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ জীবন পরিক্রমার প্রতিফলন ও গ্রহণযোগ্যতা।

বর্ণনাঃ এ স্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমগ্র জীবনের ক্রিয়াকর্ম ও ঘটনাবলিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া। এরিকসনের মতে জীবনের সংহতিবোধ অর্জন অর্থাৎ চারিত্রিক শুদ্ধতা ও সফলতা অর্জন এবং জীবন পরিক্রমাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে মৃত্যুর শর্তে (ধ্যান ধারণায়) আসাই হচ্ছে সামঞ্জস্যতা। বিগত জীবনে পালিত দায়িত্বসমূহ ও ক্রিয়াকর্মে তৃপ্তি অনুভব এ স্তরে জরুরী। এ তৃপ্তি অনুভব করতে না পারাটাই হচ্ছে বৈক্লব্য। এ স্তরে বয়স্ক ব্যক্তি তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড ও অর্জন বিশ্লেষণ করেন; তাঁর মৃত্যুর পর তার প্রজন্ম, তাঁর নিকট থেকে কী পাবে, কী তিনি রেখে গেলেন- তার মনোজগতে এসব প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং হওয়া প্রয়োজন।
জীবনের পূর্ণতা স্বীকার করে অনিবার্য সত্য মৃত্যুকে গ্রহণ করে নেবার মানসিকতাই এ স্তরের ইতিবাচক দিক।

জীবনের ক্রিয়া কর্মের অসমাপ্তির বোধ নৈরাশ্য ও মৃত্যু ভয় আনয়ন করে। এটা এ স্তরের নেতিবাচক দিক।

মূল্যায়নঃ

১। এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের স্তরগুলো উল্লেখ করুন এবং প্রত্যেক স্তরের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো শনাক্ত করুন।

২। এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। একজন শিক্ষক হিসেবে এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশের তত্ত্বকে কীভাবে কাজে লাগাবেন-আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-খ

কাজ-১ ও কাজ-২

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৬**

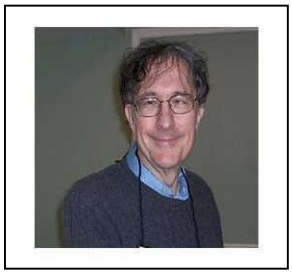

বুদ্ধি ও গার্ডনারের বহু উপাদান বুদ্ধি তত্ত্ব
(Intelligence & Gardner's multiple intelligence Theory)

ভূমিকা

যে সার্বজনীন ক্ষমতা দ্বারা কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী কাজ করতে পারে, বিচার বিবেচনামূলক চিন্তা করতে পারে এবং পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে পারে তাই হল বুদ্ধি। প্রকৃতি-পরিবেশে খাপখাইয়ে চলার জন্য, আমাদের জীবনে সমস্ত রকম ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং সমস্ত সমস্যা সমাধান করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধি আমাদের বড় হাতিয়ার। বুদ্ধি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জনের জন্য বুদ্ধির পরিমাপন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল, এম, টারম্যান সর্ব প্রথম বুদ্ধি পরিমাপের গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient বা I.Q.) শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হাওয়ার্ড গার্ডনার অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধিকে বোঝার পরিবর্তে অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেন। তিনি বুদ্ধি সম্পর্কে সাহিত্যিক বিবরণ, স্নায়ু বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদি, মেধাবী ও স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি এবং গোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বুদ্ধির ধারণা গঠন করেছেন।

এই অধিবেশনে বুদ্ধি, বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় এবং গার্ডনারের বহু উপাদান বুদ্ধি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মানসিক বয়স কী- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বুদ্ধ্যঙ্ক ও এর সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গার্ডনারের বুদ্ধির ৮টি উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব প্রতিফলন কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বুদ্ধির সংজ্ঞা ও ধারণা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা নিচের ঘটনাটি পড়ি এবং কারণ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করি।

রোকেয়া বেগম ১৯৯৫ সালে সজিব ও রাজিব নামে দু'টি যমজ ছেলের জন্ম দেন। জন্মের পর থেকে রোকেয়া বেগম উভয় সন্তানকে সমান স্নেহ, সেবা-যত্ন, খাদ্য-দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে লালন পালন করে আসছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে উভয়কে শিক্ষাদান শুরু করেন। ছেলেদের পড়ানোর জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দেন যিনি একই সাথে দুই যমজ ভাইকে পড়ান। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে দু'জন বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলাফলে দেখা গেল সজিব মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আর রাজিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা কি বলতে পারেন একই পরিবেশে সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে দু'ভাই বেড়ে উঠলেও কেন দু'জনের কৃতিত্বের মধ্যে এই ব্যাপক ব্যবধান?

হ্যাঁ বন্ধুরা, আসলে বুদ্ধিগত কারণে এই পার্থক্য। প্রিয় শিক্ষার্থী, আসুন তাহলে আমরা প্রথমেই জেনে নেই বুদ্ধি কী?

বুদ্ধি হচ্ছে একজন ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণ যাতে সচরাচর সমস্যা সমাধানকারী কিছু উপাদান বিদ্যমান এবং যা জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া ও কর্ম প্রণালী দ্বারা পরিচালিত। এই বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। ফরাসী মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড-বিনে (Alfred Binet) এ অভীক্ষা তৈরি করেন। তাকে সহায়তা করেন Dr. Simon। তাঁর এ অভীক্ষা বিনে-সিমন অভীক্ষা নামে পরিচিত। এতে ৩ থেকে ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী প্রত্যেক বয়সের জন্য ৩০ টি করে প্রশ্ন বা সমস্যা সহজ থেকে কঠিন- এভাবে কাঠিন্যের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে তৈরি করা হয়। স্মরণ শক্তি, কল্পনা শক্তি, যুক্তি প্রদান, তুলনা করা, বিচার করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এ অভীক্ষা তৈরি করা হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে এটা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মানকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এ অভীক্ষার উন্নতি করা হয় এবং স্টানফোর্ড-বিনে অভীক্ষা নামে পরিচিত হয়।

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডান পাশের কলামে লিখুন।

আলফ্রেড বিনে কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?	ফরাসী
বুদ্ধি অভীক্ষা প্রণয়নে আলফ্রেড বিনেকে সহায়তা করেন কে?	Dr. Simon
বিনে সিমন অভীক্ষা কত সালে প্রকাশিত হয়?	১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে
বিনে সিমন অভীক্ষা কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযোগী ছিল?	৩ থেকে ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী

পর্ব-খঃ বুদ্ধ্যঙ্কর ধারণা ও বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি

বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কি বলতে পারবেন এদের মধ্যে কে অধিক বুদ্ধিমান, কে কম বুদ্ধিমান এবং কে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন?

বন্ধুরা, বুদ্ধি পরিমাপের মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে যা ব্যবহার করে আমরা সহজেই বুঝতে পারি কে কতটা বুদ্ধিসম্পন্ন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল, এম, টারম্যান সর্ব প্রথম বুদ্ধি পরিমাপের গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient বা I.Q.) শব্দটি ব্যবহার করেন। যে কোন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক ব্যবহার করা হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক হলো মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাত। মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায়। সূত্রটি হচ্ছে :

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০ \qquad \left(I.Q. = \frac{M.A}{C.A} \times 100 \right)$$

কাজ-১

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডান পাশের কলামে লিখুন।

১	করিমের প্রকৃত বয়স ৩০ এবং মানসিক ২০ হলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক কত?	
২	সর্ব প্রথম বুদ্ধি পরিমাপের গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন কে?	
৩	কখন বুদ্ধি পরিমাপের গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়?	

পর্ব-গঃ গার্ডনারের বহু উপাদান বুদ্ধি তত্ত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ আমরা বুদ্ধি ও বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ হাওয়ার্ড গার্ডনার ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে তার বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন প্রচলিত I.Q. এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষা সীমাবদ্ধ ব্যাপার। শিশু ও বয়স্ক সকলের জন্য গার্ডনার বুদ্ধির ৮টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো :

১. Linguistic intelligence (শব্দ বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি)
২. Logical - mathematical intelligence (যুক্তিমূলক - গাণিতিক বুদ্ধি)
৩. Spatial intelligence (ব্যাপনস্থল সম্পর্কীয় বুদ্ধি বা দর্শনীয় অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা)
৪. Bodily-kinesthetic intelligence (শারীরিক ক্রিয়াকর্ম জনিত বুদ্ধি বা অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা)
৫. Musical intelligence (সংগীতে পারদর্শিতামূলক বুদ্ধি বা ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা)
৬. Interpersonal Intelligence (জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বা আন্ড়ঃব্যক্তিক সম্পর্কীয় বুদ্ধি)
৭. Intrapersonal intelligence (আত্ম-প্রতিপলন বা আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি)
৮. Naturalist Intelligence(প্রকৃতি পরিবেশের সাথে আদান প্রদান সম্পর্কীয় বুদ্ধি বা প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা)

গার্ডনার উক্ত ৮টি উপাদানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা:

ক) চিন্তনমূলক
খ) অনুভূতিমূলক
গ) যোগাযোগমূলক

কাজ-১

নিচের টেবিলে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বুদ্ধির উপাদানের প্রেক্ষিতে দু'টি করে উদাহরণ দিন এবং তা পরবর্তীতে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন ঠিক আছে কিনা।

ক্রমিক	বুদ্ধির উপাদান	উদাহরণ
১	শব্দ বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি	
২	আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি	
৩	আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কীয় বুদ্ধি	
৪	ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি	
৫	অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধি	
৬	দর্শনীয় অবস্থানমূলক বুদ্ধি	
৭	যুক্তিমূলক - গাণিতিক বুদ্ধি	
৮	শব্দ বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি	

পর্ব-ঘঃ বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের প্রয়োগ কৌশল

শিক্ষার্থীবৃন্দ, কোন তাত্ত্বিক জ্ঞানই কাজে আসেনা যদি না তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষক এই তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে বাস্ড়বে প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনকে ফলপ্রসূ করবেন-এটাই এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য। এ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শিখনের ক্ষেত্রে ৮টি পৃথক সম্ভাবনাকে একত্রে কীভাবে প্রতিপালন করা যাবে। শিক্ষক যদি প্রচলিত ভাষাগত অথবা যুক্তিগত নির্দেশনায় শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হন তখন বহু উপাদান বুদ্ধিকে ব্যবহার করে শিখনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। আপনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা যে কোন স্তরের শিক্ষক হোন না কেন যে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আত্ম-অধ্যয়ন (Self Study) এ

এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে একই নির্দেশনার পথ প্রয়োগ করতে পারেন। আপনি এ ৮টি বুদ্ধিকে সংযুক্ত করে নিতে পারেন অথবা এককভাবেও কার্যকর করতে পারেন।

কাজ-১

মাধ্যমিক স্তরের যে কোন বিষয়ে একটি পাঠ নির্বাচন করে এমনভাবে পরিকল্পনা করুন যাতে গার্ডনারের উল্লেখিত ৮ ধরনের বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটে। পরিকল্পনা শেষে আপনার সেটি সঠিক হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য মূল শিখনীয় বিষয়ে উল্লেখিত উদাহরণ দেখে নিন।

ইউনিট-২ অধিবেশন-৬

মূল শিখনীয় বিষয়

বুদ্ধি ও গার্ডনারের বহু উপাদান বুদ্ধি তত্ত্ব

বুদ্ধি

মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেল বলেন, Intelligence is what intelligences does. "বুদ্ধি যে কাজ করে তার মধ্যেই বুদ্ধির পরিচয়"। যে ছাত্র চটপট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাকে বুদ্ধিমান বলা হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণ করে যে সুন্দরভাবে যুক্তি দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে সেও বুদ্ধিমান। যে গৃহবধূ চমৎকার রান্না করতে পারে, সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করতে পারে সে বুদ্ধিমতী, অতএব 'কাজেই' বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধির অসংখ্য সংজ্ঞার মধ্যে মাত্র ৪টি সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হল।

১। বুদ্ধি হলো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়ার ক্ষমতা -ডিয়ার বর্ন।

২। বুদ্ধি হলো নতুন সমস্যা ও অবস্থার সাথে সংগতি বিধানের সাধারণ মানসিক শক্তি - স্টার্ন।

৩। Intelligence is the Adaptive behaviour of individual usually characterized by some elements of problem solving and detected by cognitive process and operation - Estate.

৪। Intelligence is the capacity to acquire capacity.

যে যত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে সে ততবেশি বুদ্ধিমান। প্রকৃতি পরিবেশে খাপখাইয়ে চলার জন্য, আমাদের জীবনে সমস্ত রকম ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং সমস্ত সমস্যা সমাধান করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধি আমাদের বড় হাতিয়ার।

আমরা বলি অমুকের বুদ্ধি বেশি, অমুকের কম। - কীভাবে বুঝি?

তাদের কাজকর্ম ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে বুঝি। এই বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করা হয়েছে। ফরাসী মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড-বিনে (Alfred Binet) এ কাজ করেন। তাকে সহায়তা করেন Dr. Simon। তাঁর এ অভীক্ষা বিনে-সিমন অভীক্ষা নামে পরিচিত। এতে ৩ থেকে ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী প্রত্যেক বয়সের

জন্য ৩০ টি করে প্রশ্ন বা সমস্যা সহজ থেকে কঠিন- এভাবে কাঠিন্যের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে তৈরি করা হয়। স্মরণ শক্তি, কল্পনা শক্তি, যুক্তি প্রদান, তুলনা করা, বিচার করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এ অভীক্ষা তৈরি করা হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে এটা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মানকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এ অভীক্ষার উন্নতি করা হয় এবং স্টানফোর্ড-বিনে অভীক্ষা নামে পরিচিত হয়।

বুদ্ধ্যঙ্ক

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল, এম, টারম্যান সর্ব প্রথম বুদ্ধি পরিমাপের গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient বা I.Q.) শব্দটি ব্যবহার করেন। যে কোন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক ব্যবহার করা হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক হলো মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাত। মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায়। সূত্রটি হচ্ছে :

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০ \qquad \left(I.Q. = \frac{M.A}{C.A} \times 100 \right)$$

বুদ্ধ্যঙ্ক = Intelligence Quotient সংক্ষেপে I.Q.
মানসিক বয়স = Mental age সংক্ষেপে M.A.
প্রকৃত বয়স = Chronological age সংক্ষেপে C.A
১০০ দ্বারা গুণ করা হয় ভগ্নাংশ এড়ানোর জন্য। এখানে ১০০ ধ্রুবক (Constant) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মানসিক বয়স (Mental age)

মানসিক বয়স বলতে বোঝায় বিশেষ বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সব প্রশ্ন যদি কোন শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তার মানসিক বয়স হবে তত। যেমন: ৫ বৎসর বয়সের শিশু ৫ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর দিতে পারলে তার মানসিক বয়স ৫। যদি সে ৬ বৎসর বয়সের জন্য প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তার মানসিক বয়স হবে ৬। যদি সে ৫ বৎসর বয়সের জন্য প্রশ্ন মালাটির উত্তর দিতে না পারে এবং ৪ বৎসর বয়সের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার উত্তর দিতে পারে তাহলে তার মানসিক বয়স

৪ যদিও তার জন্মগত বয়স ৫ বৎসর। বর্তমানে মানসিক বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি আরও উন্নত করা হয়েছে।

প্রকৃত বয়স

জন্ম থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দিন পর্যন্ত বয়সকে প্রকৃত বয়স বলে।

বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব

আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ হাওয়ার্ড গার্ডনার ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে তার বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন প্রচলিত I.Q. এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষা সীমাবদ্ধ ব্যাপার। শিশু ও বয়স্ক সকলের জন্য গার্ডনার বুদ্ধির ৮টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো:

১. Linguistic intelligence (শব্দ বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি)ঃ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারা, বক্তৃতা করতে পারা, কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে পারা, কোন কিছু রচনা করতে পারা ইত্যাদি। মোট কথা ভাষার প্রয়োগের দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বুদ্ধির প্রকাশ।

২. Logical - mathematical intelligence (যুক্তিমূলক - গাণিতিক বুদ্ধি)ঃ কোন ব্যাপারে যুক্তি প্রদান করতে পারা, বিতর্কে যোগ্যতা প্রদর্শন করা, বিচার বিশে-ষণ করতে পারা, অঙ্ক করতে পারা, সমস্যা সমাধান করতে পারা, বিমূর্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারা ইত্যাদি।

৩. Spatial intelligence (ব্যাপনস্থল সম্পর্কীয় বুদ্ধি বা দর্শনীয় অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা)ঃ ছবি অঙ্কন করতে পারা- আনুপাতিক দিক ঠিক রেখে, ছবি ব্যাখ্যা করতে পারা, সাজাতে পারা, মানচিত্র চার্ট নক্সা বুঝতে পারা, কোন কিছুর চিত্র কল্পনা করতে পারা, প্রতিকৃতি বানাতে পারা ইত্যাদি।

৪. Bodily-kinesthetic intelligence (শারীরিক ক্রিয়াকর্ম জনিত বুদ্ধি বা অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা)ঃ শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং শরীরচর্চামূলক কাজকর্ম যেমন দৌড়, সাঁতার ইত্যাদি ও খেলাধূলা যেমন ক্রিকেট, ফুটবল, হাডুডু ইত্যাদিতে যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শন এবং হস্তশিল্পে দক্ষ, কর্মকার, সূতার, চাষী, কাঠুরিয়া প্রভৃতি পেশার ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত বুদ্ধি।

৫. Musical intelligence (সংগীতে পারদর্শিতামূলক বুদ্ধি বা ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা)ঃ গান-বাজনা, অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ সহজে অনুধাবন ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে পারদর্শিতা প্রদর্শন।

৬. Interpersonal Intelligence (জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কীয় বুদ্ধি)ঃ অন্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারা, অন্যের আস্থা অর্জন করতে পারা, নেতৃত্ব দিতে পারা, নিজকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা, সহাবস্থানে বসবাস করতে পারা, ভালবাসা অর্জন করতে পারা, অন্যের কাজে সহযোগিতা করা, সামাজিক অবস্থা বুঝতে পারা, অন্যের অবস্থা বুঝতে পারা ইত্যাদি।

৭. Intrapersonal intelligence (আত্মপ্রতিপলন বা আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি)ঃ আত্মসচেতন হওয়া, আত্মপোলব্ধি করতে পরা, ভারসাম্য বজায় রেখে চলার যোগ্যতা, একা একা অধ্যয়ন করে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা, নিজের সবলতা ও দুর্বলতা বুঝতে পারা, অধিক চিন্তা করা, একা একা কাজ করতে ভালবাসা ইত্যাদি।

৮. Naturalist Intelligence (প্রকৃতি পরিবেশের সাথে আদান প্রদান সম্পর্কীয় বুদ্ধি বা প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা)ঃ প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা ও গতিতে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা, সৌন্দর্যবোধ, প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাতে পারা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে গবেষণা করা, প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি।

গার্ডনার দু'টি বিষয়ের বিবেচনার উপর ভিত্তি করে তার এ তত্ত্ব প্রদান করেন।

১। যে সমস্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত, তুলনামূলকভাবে তারা যে যোগ্যতা প্রদর্শন করে অথবা শিক্ষালাভে তাদের অদক্ষতা এবং

২। সমস্ত মানুষ সমান বুদ্ধি সম্পন্ন।

গার্ডনার উক্ত ৮টি উপাদানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

ক) চিন্তনমূলক :

- মৌখিক - ভাষাভিত্তিক
- যুক্তিমূলক - গাণিতিক

খ) অনুভূতিমূলক ঃ

- দর্শনীয়- ব্যাপনস্থল সম্পর্কীয় (ছবি সম্পর্কীয়)।
- শরীর- শারীরিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কীয়।
- শ্রবণীয়- সংগীত সম্পর্কীয়।

গ) যোগাযোগমূলকঃ

- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ- অন্যের সঙ্গে সম্পর্কীয়।
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ- আত্ম-প্রতিফলন।
- প্রাকৃতিক সম্পর্কীয়।

বিঃ দ্রঃ - প্রাকৃতিক ও পরিবেশ সম্পর্কীয় বুদ্ধির (Naturalist Intelligence) কথা গার্ডনার প্রথমে বলেননি, পরবর্তীতে সংযোজন করেন।

■ চিন্তনমূলক

মৌখিক-ভাষাভিত্তিকঃ লেখা ও বলায় শব্দ ব্যবহারগত কাজ- এক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি পারদর্শী তারা সাধারণত লেখা, বাগ্মীতা ও বক্তৃতা থেকে শিখনে ভাল।

যুক্তিভিত্তিক-গাণিতিকঃ সংখ্যা, যুক্তি ও বিমূর্ত ধারণা নিয়ে কাজ। এ বুদ্ধিতে যারা অগ্রগণ্য তারা সাধারণত গণিত ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ অন্যদের চেয়ে ভাল এবং যুক্তি প্রদানে সবক্ষেত্রে কিছু না কিছু পারদর্শী। বিজ্ঞান ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বিষয়ক বৃত্তি গ্রহণ তাদের জন্য উত্তম। অনেকে 'যুক্তি প্রদান' কে ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক, জ্যামিতিক, প্রতীকি এবং দৃঢ় যুক্তিমূলক খেলা গাণিতিক বুদ্ধির অন্তর্গত। আর কাল্পনিক শিকার, বিতর্ক প্রস্তুত ইত্যাদি মৌখিক-ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি।

■ অনুভূতিমূলক

দর্শনীয়-ব্যাপনস্থলঃ দৃষ্টি ও অবস্থানে বিচারমূলক কাজ। এ দলের লোকেরা সাধারণত হাত ও চোখের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। চিত্রকে সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারে এবং বস্তুকে সুন্দরভাবে সাজাতে গোছাতে পারে। এ ধরনের লোককে কারিগর, মিস্ত্রি, প্রকৌশলী, চিত্রশিল্পী বৃত্তিতে নিয়োজিত করা উচিত।

শরীর-শারীরিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কীয়ঃ এটা পেশীয় সমন্বয়, চলাচল ও কিছু শারীরিক কসরতমূলক কাজ। এ শ্রেণীতে সাধারণত খেলাধুলায় নিয়োজিত, নাচ এবং স্থানান্তরমূলক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও তারা কোন বস্তু নিয়ে কিছু করে শিক্ষা লাভ করে এবং ঐগুলির সঙ্গে তাদের শারীরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। অধিকাংশ নর্তক/ নর্তকী, খেলোয়াড়, শরীরচর্চাবিদগণ এ দলভুক্ত।

শ্রবণীয়-সংগীত সম্পর্কীয়ঃ শ্রবণমূলক কাজ। যারা এ শ্রেণীর বুদ্ধির অধিকারী তারা ভাল গায়ক-গায়িকা। তারা ভাল স্বরভঙ্গি করতে পারে এবং বাজনার তাল মেলাতে পারে। এ ব্যক্তিরা বক্তৃতা শুনে শিক্ষা লাভ করতে পারে। শ্রবণ শক্তিতে শরীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্বিক সাদৃশ্য রয়েছে যা মন ও মস্তিষ্ক সমন্বয়ে প্রক্রিয়াগতভাবে অর্জিত হয়।

■ যোগাযোগমূলক

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগঃ অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ামূলক কাজ করা। এ শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (Extrovert) এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ও ক্রিয়াকল্পে ভাল। তারা শাসকজাতক এবং জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় ও রাজনীতিবিদ হয়। যেখানে জনগণ সংশ্লিষ্ট সে সমস্ত বিষয় শিক্ষালাভে তারা আগ্রহী হয়, আলোচনা করতে ভালবাসে। এ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ ও প্রশিক্ষক হয়।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ-স্বকীয়মূলক কাজ করা। এ ধরনের বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (Introvert) এবং জটিল দর্শনের অধিকারী। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধক ও মনোবিজ্ঞানী হয় এবং একাকীত্ব ভালবাসে। এ বহু উপাদান তত্ত্বের একটি কঠোর সমালোচনা এই অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি। কেননা এটা অস্পষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য নয় বিধায় মনোবিজ্ঞানের যথাযথ আলোচনা বিঘ্নিত বিষয়।

গার্ডনার তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমাদের বিদ্যালয় এবং সংস্কৃতির অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষাগত এবং যুক্তিগত-গাণিতিক বুদ্ধির উপর প্রতিফলন ঘটায়। অন্যান্য ব্যক্তি যেমন:

শিল্পী, স্থপতি, গায়ক-গায়িকা, আলেখক (Designer), নর্তকী, থেরাপিষ্ট, শিল্পোদ্যোক্তা ইত্যাদি অন্যান্য ব্যক্তিত্ব যারা এ পৃথিবীকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় 'ভাষাগত' অথবা 'যুক্তিগত-গাণিতিক' বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থী ব্যতীত এ সব প্রতিভার অধিকারী শিক্ষার্থীদেরকে আমরা 'শিখন প্রতিবন্ধী' হিসেবে চিহ্নিত করায় তারা ঝরে পড়ে। এ সমস্ত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে চিন্তা ভাবনা ভাষাগত ও যুক্তিগত গাণিতিক নয় বলে তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। গার্ডনারের মতে বিদ্যালয়ে সমস্ত রকমের বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা চালাতে হবে। বহুবিধ বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। এ অনুযায়ী বহু উপাদান বুদ্ধি তত্ত্ব বিদ্যালয়ের কর্মকান্ড ও গতিধারায় একটা বড় রকমের পরিমার্জন চায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষকদের পরামর্শ দান করা হচ্ছে যে, তারা তাদের পাঠ উপস্থাপনে বহুবিধ কার্য সম্পাদনমূলক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবেন। যেমন- গান, সহযোগিতামূলক শিখন, শিল্পকর্ম, ভূমিকা অভিনয়, মাল্টিমিডিয়া, ফিল্ড ট্রিপ, অন্তঃপ্রতিফলন ইত্যাদি। বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

প্রয়োগ কৌশল

এ তত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শিখনের ক্ষেত্রে ৮টি পৃথক সম্ভাবনাকে একত্রে কীভাবে প্রতিপালন করা যাবে। শিক্ষক যদি প্রচলিত ভাষাগত অথবা যুক্তিগত নির্দেশনায় শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হন তখন বহু উপাদান বুদ্ধিকে ব্যবহার করে শিখনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। আপনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা যে কোন স্তরের শিক্ষক হোন না কেন যে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আত্ম-অধ্যয়ন (Self Study) এ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে একই নির্দেশনার পথ প্রয়োগ করতে পারেন। আপনি এ ৮টি বুদ্ধিকে সংযুক্ত করে নিতে পারেন। যেমন:

- ভাষাভিত্তিক এর সঙ্গে যুক্তিগত - গাণিতিককে
- দর্শনীয় ব্যাপনস্থল এর সঙ্গে শ্রবণীয়-সংগীতকে
- অন্তঃব্যক্তিক এর সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়াকে
- আন্তঃব্যক্তিক এর সঙ্গে প্রাকৃতিক-জাগতিক বুদ্ধিকে।

আবার এগুলি (৮টি উপাদান) এককভাবেও কার্যকর হতে পারে।

উদাহরণ-১ঃ অর্থনীতিতে চাহিদা ও সরবরাহ নীতি শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আপনি এ বিষয়ে পুস্তক পাঠ (ভাষা ভিত্তিক), গাণিতিক সূত্র যা এখানে প্রযোজ্য (যুক্তিভিত্তিক-গাণিতিক); এ নীতির গ্রাফিক চিত্র পরীক্ষা পর্যালোচনা (দর্শনীয়-ব্যাপনস্থল), বাস্তব জগতে এর প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ (প্রাকৃতিক সম্পর্কে) অথবা ব্যবসায়ী মহলে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক (আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ); এই চাহিদা ও সরবরাহ স্বীয় দেহে পরীক্ষা করুন। যখন পেটে খাবার দেন তখন চাহিদা (ক্ষুধা) কমে যায়; খাবার কম দিলে পেট খাবার চায় আপনি ক্ষুধা বোধ করেন (এটা অন্তঃব্যক্তিক এবং শারীরিক ক্রিয়া)। এ নীতি সম্পর্কীয় একটি গানও লিখতে পারেন (শ্রবণীয় - সংগীত)।

একই পাঠে সব উপাদানগুলি আসতে হবে তা কখনই নয়। বিষয়ের বিবেচনায় দেখতে হবে কোন কোন উপাদানকে এখানে কার্যকরী করলে ফলপ্রসূ শিখন অর্জিত হবে। প্রচলিত ভাষাভিত্তিক এবং যুক্তিভিত্তিক-গাণিতিক বুদ্ধি প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের শিখন- শেখানো কার্যক্রমে বহুবিধ শিখন প্রক্রিয়া ও সামগ্রী সংযুক্ত করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে - এ ধারণা বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের অবদান।

শিক্ষকের পরিকল্পনার উদাহরণ

শিক্ষক হিসেবে আপনি একটি বিষয় নির্বাচন করুন যা আপনি পাঠদান করবেন। একটি সাদা কাগজ নিন। কাগজের মধ্যখানে বিষয়টি লিখুন। এখন এর থেকে আটটি দাগ টানুন চক্রাকারে। আটটি দাগে ৮টি বুদ্ধি লিখুন। এখন চিন্তা করুন (Brainstorming) কোন কোন বুদ্ধি এ পাঠে কীভাবে প্রতিফলিত হবে, সে অনুযায়ী পাঠেরও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করুন।

উদাহরণ-২ঃ জ্যামিতির বিষয় ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ঃ

ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল = ১/২ভূমি দ্ধ উচ্চতা । এটা প্রমাণ করতে অঙ্কন করা (ছবি অঙ্কন), যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা (যুক্তিভিত্তিক- গাণিতিক), লিখে প্রকাশ করা (ভাষাভিত্তিক), চিত্র প্রদর্শন করে বিষয় অনুধাবন (দর্শনীয় ব্যাপনস্থল), কোন একটি স্থানে যেয়ে একটি ত্রিকোণাকার জমির কালি করে তার ক্ষেত্রফল বের করা (প্রাকৃতিক ও শারীরিক), অপর ব্যক্তিকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া (আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ), বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পরিকল্পনা করা বা চিন্তা করা (অন্তঃব্যক্তিক)।

উৎস ঃ ১. http://.www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm
and
২. http://en.wikipdia.org/Theory_of_multiple_intelligences

ES- 101
Unit - 2

শিক্ষকের পরিকল্পনার
উদাহরণ ঃ

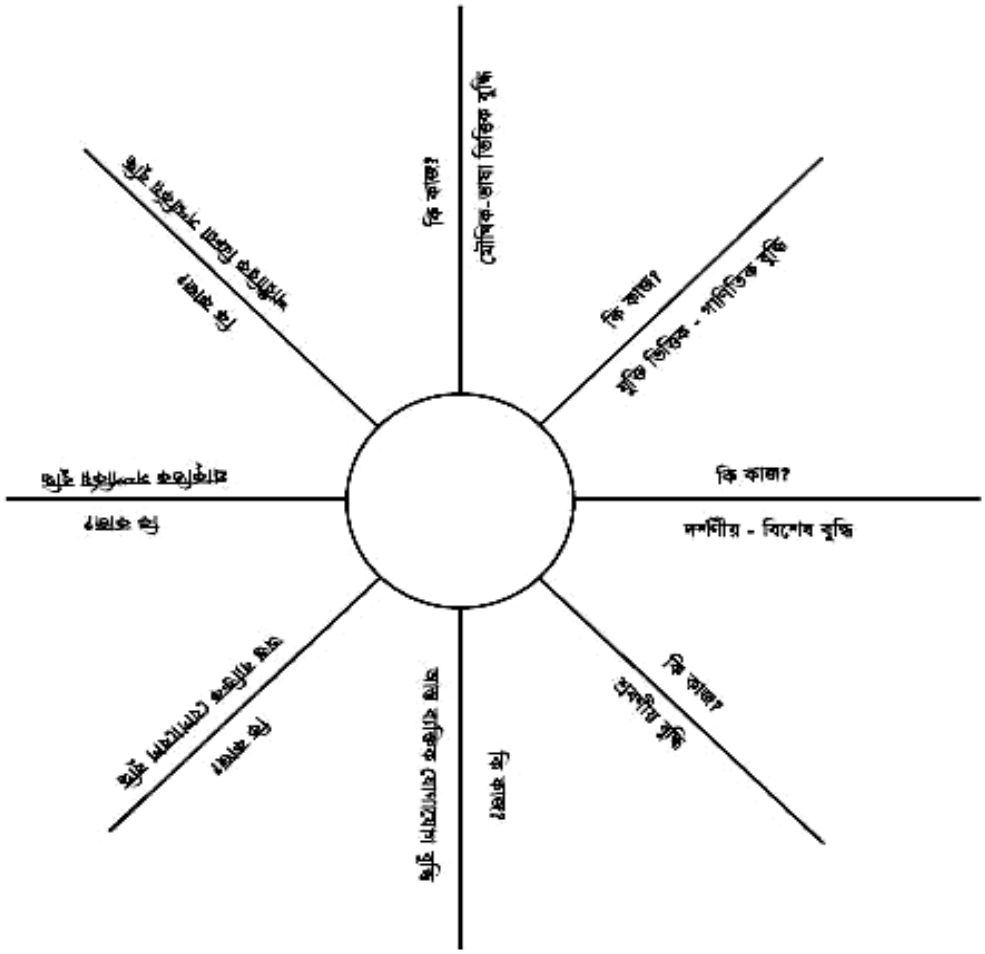

পাঠের বিষয়ের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বুদ্ধি ভিত্তিক কাজ দিন। যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি যে রূপ তার সেদিকের বিকাশ ঘটবে। সকল বিষয়ে সমস্ত বুদ্ধির প্রতিফলন হবে তা কখনই নয়। তবে যে বিষয়টি পাঠদান করবেন তার সংশ্লিষ্ট সকল বুদ্ধিমূলক কাজের অবতারণা করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. বুদ্ধির সংজ্ঞা দিন।

২. মানসিক বয়স কী তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৪. গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বটি আলোচনা করুন। শ্রেণীকক্ষে এই তত্ত্ব কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে আপনার ধারণা বিবৃত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

১। ফরাসী
২। Dr. Simon
৩। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে
৪। ৩ থেকে ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের

পর্ব-খ, কাজ-১

১। ৬৬ ২/৩ বছর
২। অধ্যাপক এল, এম, টারম্যান
৩। ১৬১৬ সালে

পর্ব-গ ও ঘ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৭**

জেন্ডার ও জেন্ডারের ভূমিকা

ভূমিকা

জেন্ডার বলতে বুঝায় সামাজিক অবস্থানে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত দায়িত্ব ও কর্মক্ষমতা। সমাজে নারী ও পুরুষ একই অবস্থানে থেকে একইভাবে কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করবে- এটিই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তবে নানা কারণে কার্যত তা লক্ষ্য করা যায় না। এখনও সমাজে নারীরা রয়েছে পশ্চাদপদ। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনশক্তিকে উন্নয়নের স্রোত ধারা থেকে দূরে রেখে কখনও জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষর অবস্থানগত পার্থক্য দূর করে নারীকে মূল স্রোতধারায় যুক্তকরণ তথা উন্নয়নের নব নব কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশেও নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান তা নিরসনের চেষ্টা চলছে।

এই অধিবেশনে জেন্ডার সচেতনতা ও জেন্ডারের ভূমিকা, জেন্ডার সম্পর্কীয় তথ্যগত ভাষা, জেন্ডার ও সেক্স শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য, জেন্ডার বৈষম্যের কারণ, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ, বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ, শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- জেন্ডার সহায়ক ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন।
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা রক্ষার পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ জেন্ডার ও জেন্ডারের ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমেই নিচের ডান পাশের বক্সটি কাগজ দিয়ে ঢেকে দিন। এরপর চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে নারীদের অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো চিন্তা করুন এবং খাতায় লিখুন। লেখা শেষ হলে কাগজটি সরিয়ে বক্সের লেখার সাথে মিলিয়ে দেখুন ঠিক আছে কি না?

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় মহিলা নীতি প্রণয়ন, যৌতুক নিষিদ্ধ আইন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন, চাকুরি ক্ষেত্রে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে ১০ ভাগ এবং মাঝারী ও নিম্ন পর্যায়ে ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রবর্তন ও বেতন মওকুফ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে জেন্ডার প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা কি বলতে পারেন কেন এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

বন্ধুরা, এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মূল কারণ হল মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতঃ নারী-পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করণ তথা জেন্ডার সমতা রক্ষা করা। স্বভাবতই আপনাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে জেন্ডার কী এবং এর প্রয়োজনই বা কী?

বন্ধুরা, অভিধানে জেন্ডার শব্দটি কোন বিশেষ্য বা বিশেষ্য বাচক শব্দের লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য যেমন- পুলিংঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ক্লিব লিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে জেন্ডার শব্দের ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজ বিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যবহার করেন। জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়; সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের

পরিচয় বা কার্য নির্দেশ করে। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, কর্ম দায়িত্ব, আচরণিক শুদ্ধতা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

পৃথিবীর সর্বত্রই অবস্থাগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নারী ও পুরুষের এ পার্থক্য নিরসন করে অধিকার ও কর্তব্যে সমতা নির্ধারণের লক্ষ্যেই বিশ্বব্যাপী জেন্ডার বিষয়টি আজ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। এখন পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর জনগণই হচ্ছেন মহিলা। ১০% মহিলা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশি সময় কাজ করছেন, কিন্তু তাঁদের কাজের বেশিটাই পুরুষের সমপরিমাণ অর্থ/ টাকা বা সম্মান আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ এর ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, জনসংখ্যায় পুরুষের তুলনায় নারী অর্ধেক হলেও বেসামরিক শ্রমশক্তিতে নারীর চেয়ে ১১.১ মিলিয়ন বেশি পুরুষ নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশে বেকার পুরুষের তুলনায় নারী বেকারের সংখ্যা বিশ লাখ বেশি। গৃহকর্মে ও চাকরিতে নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মহিলাদের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতঃ জেন্ডার সমতা রক্ষা করতে হবে। আর তা করতে পারলেই জাতীয় উন্নয়নের সচল চাকা আরও গতিশীল হবে।

কাজ-১

ডান পাশের কলামে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন এবং পরবর্তীতে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

ক্রমিক	প্রশ্নসমূহ	উত্তর
১	পৃথিবীর নিরক্ষর জনগণের কত অংশ মহিলা?	
২	পৃথিবীর কত শতাংশ মহিলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত আছেন?	
৩	বাংলাদেশের বেসামরিক শ্রমশক্তিতে নারীর চেয়ে কত সংখ্যক পুরুষ বেশি নিয়োজিত আছেন?	
৪	বাংলাদেশে বেকার পুরুষের তুলনায় নারী বেকারের সংখ্যা কত বেশি ?	

পর্ব-খঃ জেন্ডার সম্পর্কীয় তথ্যগত ভাষা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পর্ব-ক'তে আমরা জেন্ডার এবং জেন্ডারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা জেন্ডার সম্পর্কিত কতগুলো শব্দ বা টার্ম এর সাথে পরিচিত হব। বন্ধুরা, লক্ষ্য করুন নিচের টেবিলের মাঝের কলামে কিছু শব্দ/টার্ম আছে। আমরা প্রথমে এসব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ডান পাশের কলামে লিখব এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয় পড়ে আমাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করব।

কাজ-১

ক্রমিক	শব্দ/টার্ম	সাধারণ ধারণা
১	Gender জেন্ডার	
২	Gender Equality জেন্ডার সাম্য/ সম-অধিকার	
৩	Gender Equity জেন্ডার সমতা/ ন্যায়পরতা/ নিরপেক্ষতা	
৪	Gender Audit জেন্ডার নিরীক্ষণ	
৫	Gender Lens জেন্ডার লেন্স	
৬	Empowerment ক্ষমতায়ন	
৭	Sex বা লিঙ্গ	
৮	Gender Analysis জেন্ডার বিশ্লেষণ	
৯	Sex Dissaggregated Data লিঙ্গ ভিত্তিক সংখ্যাগত তথ্য	

ক্রমিক	শব্দ/টার্ম	সাধারণ ধারণা
১০	Gender division of labour জেন্ডার শ্রম-বিভাজন	
১১	Gender Mainstreaming মূলধারায় জেন্ডার	

পর্ব-গঃ জেন্ডার বৈষম্যঃ কারণ ও প্রতিকার

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা নিচের গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

কবির উদ্দিন সৈয়দ আকবর আলী হাই স্কুলের একজন কেরানি। তার স্ত্রী জমিলা বেগম একজন গৃহিণী। তাদের দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। প্রথম থেকেই তারা মেয়েদের লেখা পড়ার প্রতি উদাসীন ছিলেন। পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পর মেয়েদের আর হাই স্কুলে ভর্তি করেননি। কিছুদিন পর তাদের বিয়ে দেন। তারা দু'জনেই এখন গৃহিণী। অন্যদিকে ছেলেদের লেখা পড়ার প্রতি তারা প্রথম থেকেই অত্যন্ড় সচেতন ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই তাদের জন্য প্রাইভেট শিক্ষকসহ লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদের দুই ছেলেই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বড় ছেলে আব্দুল মুকিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ অনার্স (অর্থনীতি) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ায় কবির সাহেবের বাড়ীতে আজ আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। মুকিতের এ সাফল্যের সংবাদ পেয়ে তার দুই বোন শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে এবং আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়েছে। ছেলের এ সাফল্যে খুশি হয়ে কবির সাহেব আজ বাড়ীতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন এবং সবাই মিলে মুকিতের জন্য দোয়া করেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গল্পে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম, ছেলে এবং মেয়েদের সুযোগ সুবিধা প্রদানে পিতা-মাতার বৈষম্য। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ছেলে এবং মেয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্যই হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য।

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্র নারী-পুরুষের মধ্যে যে অবস্থানগত পার্থক্য বিদ্যমান তাই হল জেন্ডার বৈষম্য। গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, নারীর প্রতি পুরুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে জেন্ডার বৈষম্য গড়ে ওঠে। এ বৈষম্য রোধ করে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ চলছে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দায়ী কারণগুলো শনাক্ত করে পোস্টার পেপারে লিখব এবং পরবর্তীতে টিউটোরিয়াল সেশনে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করব।

কাজ-২

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো পোস্টার পেপারে লিখব এবং পরবর্তীতে তা মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করব।

মূল শিখনীয় বিষয়

জেন্ডার ও জেন্ডারের ভূমিকা

জেন্ডার সচেতনতা এবং জেন্ডারের ভূমিকা

বর্তমানকালে যে বিষয়টি সভ্যতার মাপকাঠি হিসাবে প্রায়শ আলোচিত হয়ে থাকে তা হলো কোন দেশ তার মানব সম্পদকে কীভাবে বা কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৮%) নারী। তাই নারীর অবস্থান স্বভাবতই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এ কারণে জেন্ডার নিয়ে আলোচনাও বিশেষভাবে উপভোগ্য। জেন্ডার বলতে বা জেন্ডার বিষয়ে কথা শুর" হলে আমরা সবাই ভাবি এবার মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আসলে জেন্ডার বলতে আমরা বুঝি সামাজিক অবস্থানে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত দায়িত্ব ও কর্মক্ষমতা। সমাজে নারী ও পুরুষ একই অবস্থানে থেকে একইভাবে কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করবে এটিই প্রত্যাশিত। তবে নানা কারণে কার্যত তা লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমানে দেখা যায় মহিলারা বহুক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। এ বিষয়টি অনুধাবন করে গুরুত্ব সহকারে এ অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে যথেষ্ট সহায়তা করাকে জেন্ডার সচেতনতা বলা যেতে পারে। জেন্ডার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যথার্থই যুগোপযোগী। আমরা নিশ্চয়ই একমত হব যে, বহু চেষ্টার পরও আমরা মহিলাদের ততটা অগ্রসর করতে পারিনি যা আমাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে। আঠারো-উনিশ শতক কিংবা বিশ শতকেরও প্রথম পর্বে বাঙ্গালি নারীর পরিবার কেন্দ্রিক অবরুদ্ধ জীবন ছিল। সে অবস্থা থেকে তারা এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। বাঙ্গালি সমাজে নারী পুরোপুরিভাবে যে অবরোধমুক্ত হয়েছে তা নয়। তবে এখন তার ওই পরিচয়টাই মুখ্য নয়। তাছাড়া অবরোধমুক্ত নারীদের অনেকে এমন সংস্কারমুক্ত আধুনিক জীবনধারায় অভ্যস্ত- যা সমাজের অন্য এক রূপ তুলে ধরে।

আধুনিক নারীর প্রগতি দেখে হয়তো বিস্মিত, অনেকে উপমহাদেশীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একে মেলাতে পারছেন না কিংবা কেউ কেউ একে জাতীয় ভাবধারার বিরোধী বলে মনে করছেন। কিন্তু সমাজের ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করলে, নারী পুরুষের সমান অধিকার ও যোগ্যতার প্রতি আস্থা রাখলে চলার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস রাখলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শিক্ষা গ্রহণে যদি আমরা আন্তর্জাতিক হই, আচরণে-আবরণে আন্তর্জাতিক হতে বাধা কোথায়? নারীর উপর সব নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রাখার কুপমুকতা এখনো সমাজে বিরাজ

করছে। নারীর জীবনকে সব দিক থেকে পুরুষের সমান ভাবলে নারী জীবনের আধুনিকতাকে বিরূপ দেখার প্রশ্ন আসে না। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে নারী জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটুক- সেটা সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

পৃথিবীর সর্বত্রই মহিলা ও পুরুষের মধ্যে যে অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে তা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর জনগণই হচ্ছেন মহিলা। মাত্র ১৪% মহিলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ১০% মহিলা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশি সময় কাজ করছেন, কিন্তু তাঁদের কাজের বেশিটাই পুরুষের সমপরিমাণ অর্থ / টাকা বা সম্মান আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ এর ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, জনসংখ্যায় পুরুষের তুলনায় নারী অর্ধেক হলেও বেসামরিক শ্রমশক্তিতে নারীর চেয়ে ১১.১ মিলিয়ন বেশি পুরুষ নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশে বেকার পুরুষের তুলনায় নারী বেকারের সংখ্যা বিশ লাখ বেশি। গৃহকর্মে ও চাকরিতে নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশি। স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা মহিলারা পরমুখাপেক্ষী না হয়ে শ্রমশক্তিতে অংশ নিতে এগিয়ে এসেছেন। অর্থনৈতিক কারণে মহিলারা চাকরিতে পেশায় বেশি যুক্ত হচ্ছেন। ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হলে নারীর ক্ষমতায়ন হয়, বিকাশ ঘটে মানবিক গুণের, বুদ্ধিরও - সেটা এখনো সমাজ-মানসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে না। মহিলারা আমরণ নানা ধরনের সমস্যা ও হুমকির মোকাবেলা করতে বাধ্য হচ্ছেন। যদি সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন করতে হয় তবে অবশ্য মহিলাদের জন্মগত অধিকার দিতে হবে এবং সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে তা যে কোন দেশের জন্য তাৎপর্য বহন করবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সে সব ক্ষেত্রে মহিলাদের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মহিলাদের অবস্থান অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ় করা সম্ভব হলে তা দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে। মহিলা ও পুরুষদের একইভাবে কাজে লাগানোর জন্য এবং মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন :

- মহিলাদের উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ দেওয়ার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাঁরা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান উপার্জন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।
- সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের সমান অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে সরকার মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেমনঃ ভর্তি ফরমে মায়ের নাম, পাসপোর্টে মায়ের নাম, রেজিস্ট্রি কাগজে মায়ের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রে (National Identity Card) মায়ের নাম ইত্যাদি। পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে মহিলারা তাদের অবস্থান মজবুত করতে পারবেন।
- মহিলাদের সকল সুযোগ সুবিধা দীর্ঘমেয়াদী করার প্রয়োজন রয়েছে। অনগ্রসর অবস্থা থেকে সুযোগের মাধ্যমে তাদের সম-অবস্থানে আনতে না পারলেও বেশ কিছুটা উন্নত করা প্রয়োজন। তাই সুযোগ-সুবিধাগুলি যেন বেশ কিছু সময় ধরে তারা ভোগ করতে পারেন সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ছাড়া একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি সুশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাই মহিলা ও পুরুষ উভয়কে একইভাবে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও যৌথভাবে উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে।

অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করার সময় আমাদের জানা প্রয়োজন বাংলাদেশের সংবিধানে এবং ধর্মীয়ভাবে মহিলাদের কী ধরনের অধিকার বা স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা লিখিত হয়েছে। ইসলামেও মহিলাদের যথাযথ অধিকারের কথা উল্লেখিত রয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও নারী অধিকার একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। সে সব কথা জানতে হবে, বুঝতে হবে। মহিলাদের এসব ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

নীতিগতভাবে সকলেই স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীর অগ্রায়নের বিষয়ে

ইতিবাচক ভুমিকা রেখেছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথামিক শিক্ষা, মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, মেয়েদের উপবৃত্তি কার্যক্রম ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ কারণে মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার কারণে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছে। সেই সাথে মহিলাদের গড় আয়ু ৫৪.৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ বছরে পৌঁছেছে।

জনসেবামূলক কাজে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছে। ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১০% গেজেটেড পদ, ১৫% নন-গেজেটেড পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ৩০% মহিলা শিক্ষক কোটা পূরণের চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে মহিলাদের যোগদান একটি নুতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

মহিলাদেরকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে সহযোগী ভাবতে হবে। মহিলাদের কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এভাবেই গড়ে উঠবে সুশীল সমাজ।

জেন্ডার সম্পর্কীয় তথ্যগত ভাষা

Terms	**Defination:**
Gender জেন্ডার	জেন্ডার বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের আচরণ ও দায়িত্ব, যার উৎপত্তি হয় পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে। এ ধারণাটিকে নারী-পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচরণে অন্তর্নিহিত আছে যা সমাজ ও অভিজ্ঞতার আলোকে শেখা। সময়ের সাথে সাথে এবং সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারণে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। এই ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এটি সমাজ-কাঠামোয় বিরাজমান নারীদের অধস্তন অবস্থাকে বিশ্লেষণে সহায়তা করে। সমাজে নারীদের এ অধস্তন অবস্থা পরিবর্তন ও নিরসনযোগ্য- কেননা এটি জৈবিকভাবে পূর্ব-নির্ধারিত বা চিরদিনের জন্যে নির্ধারিত নয়।
Gender Equality জেন্ডার সাম্য/ সম-অধিকার	জেন্ডার সাম্য/সম-অধিকার পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে এবং এর সুবিধা ভোগে নারী পুরুষের সম অবস্থান নিশ্চিত করে। অর্থাৎ এটি সমাজে নারী-পুরুষের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও তাদের সম্পাদিত ভূমিকার সম-মূল্যায়ন করে। এটি তাদের পরিবারে এবং সমাজে সম-অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল।

Terms	Defination:
	মূলত জেন্ডার সম-অধিকার শুরু হয় ছেলে-মেয়ের সম-মূল্যায়নের মাধ্যমে। **অথবা** জেন্ডার সাম্য হচ্ছে সমাজে নারী পুরুষের এমন একটি অবস্থান যা কিনা তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে এবং তার ফল ভোগে সহায়তা করে। অর্থাৎ এটি সমাজে নারী-পুরুষের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও তাদের সম্পাদিত ভূমিকার সম-মূল্যায়ন করে। এটি তাদের পরিবার এবং সমাজে সম-অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল। মূলত জেন্ডার সম-অধিকার শুরু হয় ছেলে-মেয়ের সম-মূল্যায়নের মাধ্যমে।
Gender Equity জেন্ডার সমতা/ নিরপেক্ষতা	এর অর্থ নারী ও পুরুষের চাহিদা অনুযায়ী অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বগত দিক থেকে সমতুল্য সুযোগ- যা নারী ও পুরুষদের একই ধরনের কাজে ঐতিহাসিক ও সামাজিক সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ দূর করে পরিপূরক স্বচ্ছ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, জেন্ডার সমতা বা নিরপেক্ষতা নারী-পুরুষের চাহিদাকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনায় রেখে এমন একটি অবস্থা তৈরি করে যেখানে নারী-পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে সমান অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়।
Gender Audit জেন্ডার নিরীক্ষণ	জেন্ডার নিরীক্ষণ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার হাতিয়ার যা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রকৃতি জেন্ডার সংবেদনশীল কি না তা মূল্যায়ন করে এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে তাদের কার্যক্রমের ভেতর কতটা কার্যকরভাবে সমন্বয় করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করে। এ নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল করতে সহায়তা করে থাকে।
Gender Lens জেন্ডার লেন্স	এটা এমন একটি হাতিয়ার; যার মাধ্যমে পুরুষের অংশগ্রহণ, চাহিদা এবং বাস্তবতার পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ, চাহিদা ও বাস্তবতাকে দেখতে সক্ষম করে তোলে। জেন্ডার লেন্স হতে পারে একটি চেকলিস্ট, একটি জরিপ, সমস্যা সমাধানমূলক নাটক অথবা তা হতে পারে যে কোন ধরনের। এটি আমাদের দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে তুলনীয় একটি শব্দ। যেমন: আমরা কোন কিছু পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণ ভাবে দেখার জন্যে দুটো সুস্থ চোখ চাই, তেমনি এর সাহায্যে স্থায়ী উন্নয়নের জন্যে নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় পরিপূর্ণ চিত্রকে দেখতে পাই। অন্যভাবে বলা যায়, নারী ও পুরুষের জীবনে কোন নীতিমালা, কর্মসূচি, বিশ্বাস ও আচরণের কি প্রভাব পড়বে এবং বিরাজিত আছে তা সুক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে।
Empowerment ক্ষমতায়ন	এটি হচ্ছে মানুষের অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে নিজ নিজ জীবন ধারার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, নিজস্ব কর্মসূচি নির্ধারণ, দক্ষতা অর্জন, সমস্যা সমাধান এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার উন্নয়ন।
Sex বা লিঙ্গ	এটি হচ্ছে একজন মানুষের জৈবিক পার্থক্য যা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

Terms	**Defination:**
Gender Analysis জেন্ডার বিশ্লেষণ	জেন্ডার বিশে- ষণ লিঙ্গ ভিত্তিক (সেক্স ডিজএগ্রিগেটেড) তথ্য সংগ্রহ ও বিশে- ষণ করে। সমাজে নারী-পুরুষ, ছেলে ও মেয়েরা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ভূমিকাই নারী-পুরুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন, চাহিদা, সম্পদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে। সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে এই জেন্ডার ভূমিকা অসম নিয়ন্ত্রণ অথবা উন্নয়নের সুবিধাদি হতে মহিলা পুরুষ যে কাউকে বঞ্চিত করতে পারে। জেন্ডার বিশে- ষণ এ সকল পার্থক্য তুলে ধরে যা নারী-পুরুষ, বালক এবং বালিকাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সঠিক নীতিমালা, কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহকে চিহ্নিত করে।
Sex Disaggregated Data লিঙ্গ ভিত্তিক সংখ্যাগত তথ্য ঃ	এটি লিঙ্গভিত্তিক তথ্যের শুধুমাত্র সংখ্যাগত চিত্রটি তুলে ধরে।
Gender division of labour জেন্ডার শ্রম-বিভাজন	নারী পুরুষের কর্মোপযোগিতা ও যথোপযুক্ততা বিচার করে সমাজ তাদের মধ্যে যেভাবে কর্ম বণ্টন/ কর্ম বিভাজন করে তাই শ্রম বিভাজন। জেন্ডার শ্রম বিভাগ সাধারণত একটি বিশেষ সমাজ, দেশ, সময় ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।
Gender Mainstreaming মূলধারায় জেন্ডার	এটা নারী ও পুরুষের চাহিদা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলের যাবতীয় নীতি ও কার্যক্রমের ডিজাইন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের অভিজ্ঞতার সমন্নয় সাধন করা। নারী ও পুরুষের সমান সুবিধা পাওয়ার এবং অসমতা দূর করার লক্ষ্যে যেসব সংগঠনে জেন্ডার কর্মকান্ডের মূলধারায় ফলপ্রসূভাবে রয়েছে, সেসব সংগঠনে জেন্ডার সংবেদনশীল সাংগঠনিক সংস্কৃতি রয়েছে। এটি এমন একটি সংস্কৃতি যাতে প্রত্যেকে তাদের দৈনন্দিন কাজে এবং পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানে সংগঠনের চাহিদা এবং জেন্ডার সমতার প্রতি প্রত্যেকে ইতিবাচক সাড়া/ আচরণ প্রদর্শন করে। অন্যভাবে বলা যায়- ● মূলধারার (প্রধান) নীতি নির্ধারণী সংস্থা ও ব্যবস্থায় জেন্ডার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। ● প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি এবং কাঠামোতে নারী উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। ● প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ ও অংশই যেন তাদের কাজে জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তা নিশ্চিত করা। ● প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী ও বিভাগের মধ্যে জেন্ডার সম্পর্ক ও সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও কর্মকান্ডে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডই যেন জেন্ডার সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখে তা নিশ্চিত করা।

জেন্ডার ও সেক্স শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য

'জেন্ডার' সমাজ-আরোপিত সংজ্ঞা (জেন্ডার বায়াসনেস: সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্য সৃষ্ট ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্য, যেমন- সামাজিকভাবে মনে করা হয় নারী হবে সেবাপরায়ণা, সংসারের কাজকর্ম ও সন্তান পালনের দায়িত্ব নারীর। আর পুরুষ হবে কঠোর, আয়-উপার্জনকারী, ইত্যাদি)। অপরপক্ষে 'সেক্স' হচ্ছে বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ফ্যাক্টর- নারী-পুরুষ নির্ধারণের সূচক (শারীরিক পার্থক্য নিরূপক)।

জেন্ডার সচেতনতাঃ এটা হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য গড়ে তোলা হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শিক্ষা, স্বাস্থ্য , অর্থনীতি, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য, নারীর দুর্বল অবস্থান সম্পর্কে সচেতন মানসিকতা গড়ে তোলা।

জেন্ডার সমতা (Equality) ও **সাম্য** (Equity) ঃ সমতা বলতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার, সাম্য বলতে বাস্তব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান তার যথাযথ এবং আনুপাতিক বণ্টন।

নারী ও পুরুষের বৈষম্যের চিত্র

জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
	৫১%	৪৯%
সাক্ষরতার হার	৫৫.৬%	৩৮.১%
বেঁচে থাকার হার (Life expectancy)	৫৮.১%	৫৭.৬%
বিয়ের বয়স	২৭.৬ বছর	২০ বছর
পরিবার প্রধান (গ্রামে)	৮৫%	১৫%
পরিবারের আয় উপার্জন	৭০%	৩০%
শ্রমক্ষেত্রে	৩৪%	২১.৩%

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ

১. গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।
২. পর্দা ব্যবস্থার অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণা।
৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ।
৪. সমাজ ও সরকার কর্তৃক বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব।
৫. মেয়েদের শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
৬. নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

১. আন্তর্জাতিক

- ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে প্রথম বিশ্ব সম্মেলন।
- ১৯৭৬-৮৫ কে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা ।
- ১৯৯৫ সালে নাইরোবিতে গৃহীত 'নাইরোবি অগ্রগতি কৌশলসমূহ'।
- ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের রাজধানী বেইজিং- এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (Beijing Platfrom For Action- BPFA) ।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ Convention for Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) ।

২. বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ

- ১৯৭৬ সালে সচিবালয়ে নারী বিষয়ক বিভাগ স্থাপন।
- মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়- পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর- মহিলাদের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- ১৯৯৭ সালে জাতীয় মহিলা নীতি প্রণয়ন।
- ১৯৯৮ সালে মহিলাদের উন্নয়নে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ১৯৯৮ সালে জাতীয় মহিলা নীতি প্রণয়ন।
- ২০০২ সালে যৌতুক নিষিদ্ধ আইন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন।
- চাকুরি ক্ষেত্রে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে ১০ ভাগ এবং মাঝারী ও নিম্ন পর্যায়ে ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণ।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

- সার্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে গণশিক্ষা।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রবর্তন ও বেতন মওকুফ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ।
- প্রতিটি উপজেলা একটি করে বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে জেন্ডার প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্তি।
- শিক্ষকদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেন্ডার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধা যেমন: মেয়েদের/ মহিলাদের জন্য নিরাপদ টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।

মূল্যায়নঃ

১. জেন্ডার বলতে কী বোঝায়? সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. নারী ও পুরুষ প্রেক্ষিতে বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করুন এবং সেগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩. জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিবরণ দিন।

৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা রক্ষার পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন এবং নতুন করে আর কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

১। দুই-তৃতীয়াংশ
২। ১৪%
৩। ১১.১ মিলিয়ন
৪। বিশ লাখ

পর্ব-খ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ, কাজ-১ ও ২

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৮**

এরিকসনের জীবন বিকাশ ও গার্ডনারের বুদ্ধি তত্ত্বের সমালোচনা

ভূমিকা

এরিক এরিকসনের ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে মনঃসামাজিক বিকাশ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রদান করেন। আমরা ইউনিট ২ এর ৫ নং অধিবেশনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। আর আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হাওয়ার্ড গার্ডনার ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে তার বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন যা ইউনিট-২ এর অধিবেশনে-৬ এ আলোচনা করা হয়েছে। এই অধিবেশনে আমরা তত্ত্ব দু'টির সমালোচনায় অবতীর্ণ হব। আমরা জানি, প্রতিটা তত্ত্বের যেমন ইতিবাচক দিক থাকে তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতা বা নেতিবাচক দিকও থাকে। সমালোচনার মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক শনাক্ত করে সতর্কতার সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে এসব তত্ত্ব প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- এরিকসনের মনঃসামাজিক জীবন বিকাশ স্তরসমূহের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।
- গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক তার দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারবেন।

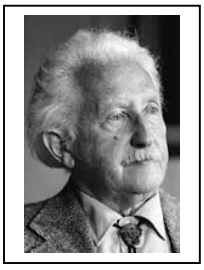

পর্ব- কঃ এরিক এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনা

প্রিয় শিক্ষার্থী, আসুন আমরা এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তত্ত্বটির মূল বক্তব্য পুনরায় স্মরণ করি।

এরিকসন (১৯৬৮) মনে করেন, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের সময় কিছু সংকটের মাধ্যমে তার আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। বিকাশের এই সংকটগুলো হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; নয়তো বিকাশের গতিকে ব্যাহত করে। আমাদের ব্যক্তিত্ব কতটা সংহতিপূর্ণ হবে তা এই সংকট দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এরিকসন ধারণা পোষণ করেন যে, ব্যক্তি যখন বেড়ে ওঠে তখন সে সমাজের বিভিন্ন লোকজনের সাথে ভাবের আদান প্রদান করে। এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তি তার পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় এবং চারদিকের জগতকে ও নিজেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এরিকসনের মতে, ব্যক্তি যখন গ্রহণযোগ্য উপায়ে তার সংকটগুলো বা মনোসামাজিক সমস্যাগুলো নিরসন করতে পারে তখনই তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে।

এরিকসন মনঃসামাজিক বিকাশের ৮টি সুনির্দিষ্ট স্তরের কথা উল্লেখ করেন। যথা: মৌখিক অনুভূতি স্তর, পেশীজ ও পায়ু স্তর, স্বয়ংক্রিয়াশীল স্তর, সুপ্ত প্রতিভা স্তর, দ্রুত বিকাশ স্তর, যৌবন কাল, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং পরিপক্ক স্তর।

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা এবার এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো শনাক্ত করি এবং পরে তা বর্তমান অধিবেশন এবং ইউনিট ২ এর ৫ নং অধিবেশনের মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখি এবং আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করি।

ক্রমিক	সবল দিক	দুর্বল দিক
১		
২		
৩		
৪		
৫		

পর্ব-খঃ গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের সমালোচনা

প্রিয় শিক্ষার্থী, চলুন আমরা এবার গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের মূল কথা স্মরণ করি ।

আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ হাওয়ার্ড গার্ডনার ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে তার বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। শিশু ও বয়স্ক সকলের জন্য গার্ডনার বুদ্ধির ৮টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেন। তা হলো: শব্দ বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি, যুক্তিমূলক-গাণিতিক বুদ্ধি, দর্শনীয় অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা, সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কীয় বুদ্ধি, অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি এবং প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা। গার্ডনার উক্ত ৮টি উপাদানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা:

ক) চিন্তনমূলক

খ) অনুভূতিমূলক

গ) যোগাযোগমূলক

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা এবার গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক শনাক্ত করব এবং তা বর্তমান অধিবেশন এবং ইউনিট ২ এর ৬ নং অধিবেশনের মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখব। (পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)

ক্রমিক	সবল দিক	দুর্বল দিক
১		
২		
৩		
৪		
৫		

ইউনিট-২ অধিবেশন-৮

মূল শিখনীয় বিষয়

এরিকসনের জীবন বিকাশ ও গার্ডনারের বুদ্ধি তত্ত্বের সমালোচনা

এরিক এরিকসনের **জীবন বিকাশের** ৮টি স্তর যেমন:

স্তর	বয়স	দ্বন্দ্ব		
১ম স্তর	জন্ম থেকে ১ বৎসর	বিশ্বাস	বনাম	অবিশ্বাস
২য় স্তর	১ থেকে ২ বৎসর	স্বাধীনতা	বনাম	সন্দেহ
৩য় স্তর	২ থেকে ৬ বৎসর	উদ্যোগ	বনাম	অপরাধ
৪র্থ স্তর	৬ থেকে ১২ বৎসর	উদ্যম	বনাম	হীনমন্যতা
৫ম স্তর	১২ থেকে ১৮ বৎসর	আত্মবোধ	বনাম	দ্বিধা
৬ষ্ঠ স্তর	১৯ থেকে ৪০ বৎসর	ঘনিষ্টতা	বনাম	একাকীত্ব
৭ম স্তর	৪০ থেকে ৬৫ বৎসর	অগ্রমুখীতা	বনাম	বদ্ধতা
৮ম স্তর	৬৫ থেকে মৃত্যু	সামঞ্জস্যতা	বনাম	বৈক্লব্য

- এখানে বয়সের স্তর যা দেখানো হয়েছে সেটাকে দৃঢ়ভাবে ধরা যায় না। বিভিন্ন দেশ, জলবায়ু ও সংস্কৃতি ভেদে এটা পরিবর্তনীয় । যেমনঃ বাংলাদেশে সাধারণত ৩০/৩২ বৎসর বয়স থেকেই পিতৃত্ব/ মাতৃত্বের ব্যাপারটি এসে যায় সেটা ৭ম স্তর । এরিকসন এ স্তর ৪০ থেকে ৬৫ বৎসর বয়স দেখিয়েছেন।
- মনোবিজ্ঞানী এরিকসনের তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে মনঃসমীক্ষণবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এটি ব্যক্তি জীবন বিকাশে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। মনঃসমীক্ষণ বাদে মানুষের জীবন বিকাশকে তার অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টার দ্বারা চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াকে এখানে জীবনের নৈতিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। কিন্তু মনঃসামাজিক তত্ত্বে জীবন বিকাশকে ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখা হয়েছে। ব্যক্তির জীবন বিকাশ যেমন বহির্মুখী তেমনি তার কারণও বহির্মুখীতা।

- এ তত্ত্বে মানুষের জীবন বিকাশকে মনের সুস্থতার দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এখানে জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে জীবন বিকাশের স্তরগুলো অনেক বেশি বিস্তৃত করা হয়েছে। এরিকসন এ বিকাশকে জীবনের কৈশোরকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ দিক হতে বিচার করলে দেখা যাবে এরিকসন তার তত্ত্বে বিকাশের প্রক্রিয়াকে অনেক ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।
- এরিকসন মতবাদের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো ব্যক্তির জীবন বিকাশ নির্দিষ্ট সময়ে কতটুকু হয়েছে বা হবে তার পরিমাপ করা হয়নি। আধুনিক মনোবিদগণ এক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যা মানতে রাজি নন। বর্তমানে কিছু কিছু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে- এরিকসন যে বিকাশ স্তরগুলোর কথা বলেছেন, তা সকল ব্যক্তির জীবনে সর্বজনীন ক্রমঃঅনুসরণ করে না। ব্যক্তির জীবনে সংকটের পরিবর্তন হতে পারে এবং তার দরুন বিকাশের গতিও ভিন্ন রকমের হতে পারে। মনঃসামাজিক তত্ত্বে এ দিকটি সঠিকভাবে বিচার করা হয়নি। তাই অনেকে মনে করেন যদিও এ তত্ত্বের অনেক অভিনবত্ব এবং সম্ভাবনা রয়েছে তথাপি এর দ্বারা ব্যক্তি জীবনের সামগ্রিক বিকাশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

উৎস ঃ http://.en.wikipedia.org/wiki/Theory _of_multiple_intelligences

গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের সমালোচনা

বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বের প্রবর্তক হাওয়ার্ড গার্ডনার তার তত্ত্বে বুদ্ধিকে নতুন রূপে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধির সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

- তাঁর তত্ত্বের একটি বড় সমালোচনা হল- তিনি বুদ্ধির সংজ্ঞা প্রসারিত করেন নাই বরং এতদিনের প্রচলিত বুদ্ধির সংজ্ঞা অস্বীকার করেছেন। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা Ability বা সামর্থ্য বলতে যা বুঝিয়েছেন তিনি তাকে "বুদ্ধি" বলেছেন। যেমন: সঙ্গীত সম্পর্কীয় বুদ্ধি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তিনি মেধাকে "বুদ্ধি" বলেছেন। মনীষী রবার্ট জে. স্টার্নবাগ (১৯৯১), ইসেঙ্ক (১৯৯৪) এবং স্কার এ সমালোচনা করেছেন।

- গার্ডনার বুদ্ধির কোন একক সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। তিনি প্রাথমিকভাবে বুদ্ধিকে যে কোন সংস্কৃতিতে যে কোন মূল্যবোধ সম্পর্কীয় সমস্যা সমাধানের সামর্থ্যকে বুঝিয়েছেন। তিনি পূর্বাপর সম্পর্ক না রেখে সুরুচিসম্পন্ন শৈল্পিক বিচারে বুদ্ধির শ্রেণী বিভাগ করেছেন। একটি বুদ্ধিকে নির্বাচন করতে হলে গবেষকের দৃষ্টিতে সেটি বুদ্ধির উপযুক্ত মানদন্ড সম্পন্ন কিনা তার ধারাবাহিক বিচার বিশ্লেষণটি কাম্য; কিন্তু এ তত্ত্বে তার অভাব রয়েছে।
- গার্ডনার বলেছেন, "কোন কোন মানুষ বুদ্ধি প্রদর্শন করে এবং অন্যরা করে না এই অন্যায্য ধারণাকে ভেঙ্গে দিতে চাই"। তাঁর এ বক্তব্য অনুযায়ী যে কোন আগ্রহ অথবা সামর্থ্যকে 'বুদ্ধি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ সমান বুদ্ধি সম্পন্ন ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোন না কোন আগ্রহ বা সামর্থ্য আছে। এ কথায় এখানে দু'টি সমস্যা এসে দাঁড়ায়:

  ক) "সকল মানুষ সমবুদ্ধি সম্পন্ন" -গার্ডনার এটা প্রমাণ করেন নাই বরং তার ধারণার উপর বলেছেন।

  খ) গার্ডনার 'সামর্থ্য' বা 'মেধা' কে বৃহত্তর ধারণায় বুদ্ধি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার তত্ত্বকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করেছেন; বিধায় তাঁর তত্ত্ব অধ্যয়ন অসুবিধাজনক। যে শিক্ষার্থী প্রকৃতির প্রতি আগ্রহী তার প্রাকৃতিক সম্পর্কিত বুদ্ধি আছে আবার যে শিক্ষার্থী অধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের প্রতি আগ্রহী তার 'আধ্যাত্মিক বুদ্ধি' আছে - এভাবে বলেছেন।

মূল্যায়নঃ

১। এরিকসনের মনঃসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো শনাক্ত করুন।

২। গার্ডনারের বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক তার দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ, কাজ-১ ও ২

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।